স্কন্দ গুপ্ত

সুদীপ্তপ্রকাশ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মরিয়ম একটি ঐতিহাসিক নাম। আওরঙ্গজেব যখন দিল্লীর বাদশা সেই সময়ে বিজাপুরের সুলতান আদিল শার নাচঘরের বাঈজী মরিয়ম। অলোকসামান্যা রূপসী এই বাঈজী তাঁর অসীম কূটনীতিজ্ঞানে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যতটুকু কীর্তি রেখে গেছেন তার দাম অমূল্য। ছদ্মনামের আড়ালে শক্তিমান লেখক স্কন্দ গুপ্ত ইতিহাসের এক লুপ্ত অধ্যায় উদ্‌ঘাটন করলেন।

মরিয়ম বাঈ

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ঘনিয়ে এল মহারাষ্ট্রের পাহাড়ে, পর্বতে, বনে জঙ্গলে মাঠে, ময়দানে। চারধারে নিঃসীম নীরবতা। এখানে সেখানে শুধু ঝিঁঝির ডাক। রাত্রির অন্ধকার অবগুণ্ঠনে একে একে হারিয়ে গেল বিজাপুর রাজ্যের গ্রাম নগর, হারিয়ে গেল আদিল শাহের সুরম্য প্রাসাদ। অন্ধকার সামিয়ানার নীচে, ঢাকা পড়ে গেল বিজাপুর রক্ষীবাহিনীর অসংখ্য অগুন্তি তাঁবু।

এই অন্ধকারেই সুলতানের দূত যাত্রা করবে রায়গড় দুর্গপথে। আজকের রাত্রির মধ্যেই শিবাজীর কাছে প্রস্তাব পেশ করে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত নিয়ে সকালের আগেই ফিরে আসবে। আদিল শাহের জলসাঘরের প্রাণসঞ্চারিণীর কাছে এ খবর অবিদিত নয়।

মরিয়মের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের পরিধিতে দ্রুতলয়ে আর একটি অসাধারণ রাত্রি নেমে আসছে। আর একটি আশা আর আশঙ্কা মিশ্রিত অস্থির রাত্রি।

দু'একটা করে রাত জাগা পাখি মাথার উপর দিয়ে ডানার ঝাপটা মেরে উড়ে চলে গেল। জলাশয়ের পাড়ে ঝাউ বীথি সাঁই সাঁই শব্দ তুলল। মরিয়মের ঘরে এসে ঢুকল এক ঝলক হাওয়া। স্তিমিত হয়ে এল পশ্চিম প্রান্তের ঘরে ঘরে বান্দা ও বাঁদীদের কলগুঞ্জন।

জলসাঘর সংলগ্ন সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসে আপন মনে অনেক কিছুই ভাবছিল মরিয়ম। মর্মতলে কিসের যেন একটা আহ্বান। মন চলে গেল রায়গড় প্রাসাদে।

সেখানে বিনিদ্র রজনী যাপন করছে মারাঠাবীর শিবাজী, কখন কোন পথে শত্রু শিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার পরিকল্পনা করছে। সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে বসে অন্তরঙ্গ আলোচনায় আপন সংকল্পের সঠিক রূপায়ণের পথ খুঁজছে।

সেখানেই দূত পাঠাচ্ছে আফজল খাঁ। খবর দিচ্ছে ওর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্যে। দেখা করার আসল উদ্দেশ্য সন্ধি। সে সন্ধির সর্ত আলোচিত হবে সাক্ষাতে।

দূত হয়ে যাচ্ছেন কৃষ্ণাজী। মারাঠা ব্রাহ্মণ, বিজাপুর সুলতানের বেতন ভুক কর্মচারী। কাজে সফল হতে পারলে চাকুরীতে উন্নতি। এ প্রলোভন দুলছে ওঁর মনের সামনে।

মরিয়মের মনে হল, কৃষ্ণাজীর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। নিশ্চয় তাঁকে বোঝালে তিনি বুঝবেন। মানবেন ওর ধারালো যুক্তি। শিবাজী যে সত্যি সত্যি সকলের মঙ্গল কামনা করে, তা বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় কৃষ্ণাজী অবিশ্বাস করবেন না।

আর দেরী করা উচিত হবে না। এই মূহূর্তে কৃষ্ণাজীর কাছে যাওয়া ভালো। শুভ বুদ্ধির পায়ে করুণ আবেদন কি সার্থক হবে না।

মরিময় তার ঘরের দুয়ার খুলে এদিক ওদিক দেখে নিল একবার, না কেউ নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে পা বাড়াল ডান দিকের বারান্দায়। পার হল বেগম মহল। কত কারুকার্যখচিত স্ফটিক প্রস্তরের দেয়াল, স্তম্ভ ও খিলানগুলি। পার হল লালপাথর নির্মিত আদিল শাহের প্রধান ও প্রিয় বেগম জুলেখার খাসমহল। তারপর গোলাপ বাগিচা। মরিয়ম আলতো আঙুলে একটি বসরাই গোলাপ ছিঁড়ে ধরল নাকের কাছে। কী মধুর খুশবাই। ফোয়ারার মধ্যে অবিশ্রান্ত বর্ণালী জলবিন্দুধারায় গ্রাস করছে বিবসনা অনন্তযৌবনা প্রস্তরময়ী নারীমূর্তি। ফোয়ারা তো নয়, যেন বেহেস্তের খুন।

হাজির হল সুলতান প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে। সশস্ত্র নজরদার পাহারা দিচ্ছে।

বোরখাঢাকা নারীমূর্তি দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল নজরদার।

টায়রা থেকে বোরখার আচ্ছাদন সরাল মরিয়ম। হাসিমুখে তাকাল নজরদারের দিকে।

বলল, কৃষ্ণাজী কোন কুঠীতে থাকেন সিপাহীসাহেব ?

নজরদার ডান হাতে পূর্ব দিকে নির্দেশ করে বলল, সিধা চলে যান।

কত দূর এখান থেকে।

বেশী দূর নয়। মিনিট তিন চার পায়দলে গেলেই পৌঁছে যাবেন।

আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসতে পার ?

কিন্তু···

চিন্তা নেই তোমার, বিজাপুরাধিপতি আমায় পাঠিয়েছেন। কৃষ্ণাজী এখুনি প্রতাপগড় যাবেন আফজল খাঁর দূত হয়ে। কিছু জরুরী ও গোপন আখবর তাঁর কানে তুলে দিয়ে আসতে হবে।···

সুলতানের পাঞ্জা নেই মরিয়মের হাতে। তাই গোপন খবর বলে তাক লাগাতে হল নজরদারকে।

সৈনিক প্রথায় বুটে বুট ঠুকে কুর্নিশ জানিয়ে রক্ষী বলল, আসুন আমার সঙ্গে

বোরখায় আবার মুখ ঢাকল মরিয়ম। আড়াল করল তার মসৃণ দেহবল্লরী। রক্ষীকে নীরবে অনুসরণ করে চলল এগিয়ে।

কৃষ্ণাজী তখন পোশাক পরছিলেন। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি মারল মরিয়ম। রেশমের জরিদার চাপকানের তলায় চোস্ত পরে কোমরে চামড়ার খাপে গুপ্তি বাঁধছিলেন।

বন্দেগী কৃষ্ণাজী !

নারীকণ্ঠ শুনে ঈষৎ চমকে পেছন ফিরলেন কৃষ্ণাজী। গুপ্তিটা তাড়াতাড়ি ঢাকলেন চাপকানের ঝুলে।

আপনার সঙ্গে ইনি কথা বলতে এসেছেন।—নজরদার বলল।

কে ইনি ? কৃষ্ণাজীর প্রশ্ন।

জাঁহাপনার কাছ থেকে আসছেন। কী আখবর, এঁর মুখেই শুনতে পাবেন। প্রধান ফটকে কেউ নেই, আমি চলি।

কৃষ্ণাজী এগিয়ে এলেন।

বোরখা খুলে ফেলল মরিয়ম। ভাঁজ করে হাতে নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে কালো বোরখার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করল এক উদ্ভিন্নযৌবনা উর্বশী।

আপনার ঘরে আমি ঢুকতে পারি কৃষ্ণাজী ?

কেন পারবে না মা ? কোন আপত্তি নেই আমার।

কিন্তু আমি যে মুসলমান।

আর আমি যে মুসলমানের নোকর মা।

মোলায়েম করে হাসল মরিয়ম। গালে ওর টোল পড়ল।

নিজেকে অত ছোট করছেন কেন ব্রাহ্মণ ?

ছোট তো করছি না মা। আমি যা তাই তো বলছি। কোন মাসে আদিল শাহের তলবে পেটের আগুন নেভাই। আবার কোন মাসে আফজল খাঁর। কিন্তু আপনি কে ? আপনাকে চিনতে পারলাম না মা।

আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না কৃষ্ণাজী। আমি কে তা আমি নিজেও জানিনা। শুধু জানি আমি বাঈজী। আদিল শার জলসামহলের সর্বময় কর্ত্রী। বাঈজীদের অতীত কারুর জানতে নেই।

হয়েছে মা। এবার বুঝেছি। কিন্তু কি মনে করে মা ?

আপনার কাছে একটা আর্জি পেশ করতে এসেছি কৃষ্ণাজী।

কি সেই আর্জি ?

আপনি কি এক্ষুণি প্রতাপগড় যাচ্ছেন ?

গোপন খবর সকলের কাছে যে বলতে নেই মা।

আমার কাছে বলতে পারেন কৃষ্ণাজী। বিজাপুর সুলতানের কোন গোপন খবরই আমার অজানা নয়।

তা-তো নজরদার এনে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে দেখেই বুঝতে পেরেছি মা। কিন্তু কি বলতে এসেছেন আপনি ? জাঁহাপনার কোন আদেশ কি আপনি বহন করে এনেছেন ?

তার জন্যে তো অনেক বান্দা তলব পাচ্ছে। আমি এসেছি আমার বিবেকের আদেশ বহন করে। একটি আবেদন আপনার কাছে পেশ করতে।···আমাকে 'আপনি' করে বলবেন না।

কি সেই আবেদন মা?

কৃষ্ণাজী! আমি জানি আপনি একটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে রায়গড় যাবেন।

বল মা—

আপনি নিশ্চয় জানেন আফজল খাঁ শিবাজীকে কেন ডেকে পাঠাচ্ছে।

খাঁ সাহেব না বললেও সে খবর রাখি বৈকি মা।

তাহলে এত বড় অন্যায়কে আপনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন?

আমি আফজল খাঁর নোকর মা। যার খাই তার গুণও গাইতে হবে। যার কাছ থেকে তলব পাই তার হুকুমও তামিল করতে হবে।

কৃষ্ণাজী!

মরিয়ম দু'পা এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখে চোখ রেখে বলল: ভুলে যাবেন না কৃষ্ণাজী আপনি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মতেজের কণা মাত্রও যদি আপনার ভেতরে অবশিষ্ট থাকে, আপনি এ চক্রান্তের পেছনে দাঁড়াবেন না।

না, না। তা হয় না মা, তা হয় না। আমি এতবড় বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারবনা।

আপনাকে পারতে হবে কৃষ্ণাজী: মরিয়মের গলার স্বর পর্দায় পর্দায় চড়তে থাকল: পারতে হবে আমার আপনার মত নিঃস্ব মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে। শিবাজী যদি আফজল খাঁর হাতে নিহত হয় তাহলে আমাদের জীবনে সুদিন ফিরে আসবে বলে কি আপনি মনে করেন?

মরিয়মের দৃপ্তভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণাজী অনেকটা দমে গেলেন।

তাঁর কণ্ঠ উত্তাপ হারাল। গলার স্বর নীচুতে নামিয়ে জানতে চাইলেন : শিবাজী কি আমাদের মত মানুষগুলোর জন্য যুদ্ধ করছে?

তেমনি দৃঢ়তা বজায় রেখে মরিয়ম বলল : হ্যাঁ কৃষ্ণাজী, শিবাজীর ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্যই হল তাই। এই সব সুলতান, জায়গীরদার গরীব প্রজাদের শোষণ করে বিলাস ব্যসনে আত্মহারা। সাধারণ মানুষের দৈন্যের দিকে তাঁদের বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই। অবিচারে মানুষ আজ জীবন্মৃত। এ সব প্রত্যক্ষ করে শিবাজী নতুন শাসন প্রবর্তনের সঙ্কল্প নিয়েছেন।

কৃষ্ণাজী বেশ অবাক হয়ে শুনলেন। চুপ করে থাকলেন খানিকক্ষণ। বোধ হয় মরিয়মের কথার মর্মার্থ অনুধাবনের চেষ্টা করলেন। মিলিয়ে নিলেন শিবাজীর কর্মধারার সঙ্গে।

এর আগেও দু-একবার কৃষ্ণাজীকে এ পক্ষের দূত হয়ে যেতে হয়েছিল রায়গড়ে। তখন তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন রায়গড়বাসীদের। শুনে এসেছেন তাদের কথাবার্তা। কারুর কারুর সঙ্গে আলাপও জমিয়ে ফেলেছিলেন কৃষ্ণাজী। শিবাজী নতুন জীবনের তোরণ উদ্‌ঘাটন করছেন এমন গন্ধ পেয়েছিলেন সেখানে।

কিন্তু এই যুবতী আদিল শাহের হারেমে বসে এত সব জানল কী করে!

মরিয়ম বলল আবার, আমার শেষ আর্জি পেশ করে যাব মারাঠা বীরের কাছে। যদি পারেন, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রেখে আফজল খাঁর থাবা থেকে পর্বতমূষিককে বাঁচাবেন।

চোখ ফেরালেন কৃষ্ণাজী। বললেন, আমার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে গেলে তোমার ধর্মের যে ক্ষতি হবে মা?

আপনার ও আমার ধর্ম আলাদা নয় কৃষ্ণাজী। আমাদের ধর্ম সুস্থভাবে বাঁচা ও বাঁচতে দেওয়া। এর যারা অন্তরায় কেবল তারাই আমাদের বিপক্ষে। কেউই অশান্তি চায় না কৃষ্ণাজী। কী মুসলমান কী হিন্দু, কেউ না। শান্তির কামনা, শান্তির জন্য সাধনাই আমাদের ধর্ম।

কৃষ্ণাজীর মুখের অন্ধকার তবু ফর্সা হল না। বললেন, তোমার আসল পরিচয় কি জানতে পারব না মা ?

আপনার মনে কি কোনো সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। আপনি কি মনে করছেন যে আমি আফজল খাঁর চর ? আপনার সততা যাঁচাই করতে আমায় পাঠিয়েছেন আফজল খাঁ ?

না মা। তা কখনো মনে করি নি। ভাবছি, এমন তীক্ষ্ণধার যার বুদ্ধি, এমন শাণিত যুক্তি যার, সে কে হতে পারে।

প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে মরিয়ম বলল, ভেবে দেখবেন কৃষ্ণাজী, আপনার ন্যায়-অন্যায় কর্মের ফল কোটি কোটি লোক ভোগ করবে। কোটি কোটি লোকের ভাগ্য আপনার হাতের মুঠোয়। এমতাবস্থায় ভীষণ হুঁশিয়ার হয়ে মঙ্গলপ্রসূ কর্তব্য আপনাকে বেছে নিতে হবে।

বোরখা পরল মরিয়ম। পূর্ণিমাকে যেন গ্রাস করল অমাবস্যা। সন্ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল কৃষ্ণাজীর প্রকোষ্ঠ থেকে।

একটা রহস্যময় বিমূঢ়তা কৃষ্ণাজীকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। নারীগন্ধে কষ্টি পাথরের চওড়া দেয়ালগুলি মদির হয়েছে। কৃষ্ণাজী মদির হলেন আদর্শ ও অনাদর্শের লড়াইয়ে।

অলিন্দে গবাক্ষে ঝাড়লণ্ঠনের আলোর ছটা। যৌবনবতী বাঁদী ও বাঈজীদের মস্করার নূপুর নিক্কণ। রাত্রির আসন্ন উৎসবের মাতাল পদধ্বনি প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে।

আদিল শার হারেমে আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেড়েছে। বীরাবাঈ-এর। আশ্রয় প্রার্থিনী হয়ে এসে বীরাবাঈ আজ বন্দিনী। মুক্তির পথ পাচ্ছে না। জাবেলী দুর্গ ছেড়ে আসার মূহূর্তে যে নব দিগন্তের আশা করেছিল বীরাবাঈ, তা-ও দেখতে পাচ্ছে না।

কত দিন হয়ে গেল করুণ পলায়ন। যত দিন যাচ্ছে পলায়নের ফল মুক্তির দিকে না গিয়ে, চলে যাচ্ছে দুঃখের দিকে।

দুঃস্বপ্ন জর্জরিত পলায়নের রাত্রির কয়েক দিন আগে শিবাজী বীরাবাঈ এর পিতা চন্দ্র রাও-এর সকাশে দূত পাঠালেন। দূত অপ্রত্যাশিত এক খবর দিল। শিবাজী চন্দ্ররাও-এর সাক্ষাৎ প্রার্থী।

চন্দ্ররাও হঠাৎ কী ভেবে শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়ে গেলেন। একে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ, তার উপর জীবন্ত বিভীষিকার মত শিবাজী কখন অতর্কিতে আক্রমণ করে ছিনিয়ে নেবে জাবেলী দুর্গ তার ঠিক নেই। সুতরাং দেখাই যাক না যদি শিবাজীর সহযোগিতায় নির্ঝঞ্ঝাটে শাসন করতে পারা যায় তো মন্দ কী। এই রকম ভাবলেন চন্দ্ররাও।

কিন্তু তাঁর রক্ত যে স্বাধীনতা-প্রয়াসী, তিনি যে কারুর পরামর্শের বা শাসনের প্রত্যাশা করেন না, এ কথা সাময়িকভাবে ভুলে গেলেন।

অমাত্যবর্গেরা বলেছিল ঃ কেন শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন মহারাজ ?

চন্দ্ররাও বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিল, কেন, সাক্ষাৎ করলে দোষ কী ?

ও বড় চতুর। ওকে নিয়ে খেলা করায় বিপদ আছে।

আমার দুর্গের ভিতরে এসে কী চাতুর্য দেখাবে শিবাজী !

সেনাপতি ঘোড়পুরে বলেছিল, ও বড় নিষ্ঠুর।

হলই বা নিষ্ঠুর। বাঘও তো নিষ্ঠুর। কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘ কি নিষ্ঠুরতা দেখতে পারে ? জাবেলী দুর্গ কি শিবাজীকে আটকে রাখতে পারবে না ? আপোষে আমাদের স্বার্থ যদি চুকিয়ে ফেলতে পারি ভালো কথা, নইলে জাবেলী দুর্গের লৌহ তোরণগুলি হঠাৎ বন্ধ করে দেব, আর শিবাজী গর্জন করতে থাকবে। হাঃ হাঃ হাঃ....

ঘোড়পুরে চন্দ্ররাও-এর কূটনীতিতে ভরসা স্থাপন করতে পারে নি। বলেছিল, মহারাজ, ওই চাষাড়ে লোকটার সংস্পর্শে না আসাই ভালো।

চন্দ্ররাও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেই শিবাজীকে আহ্বান জানিয়েছিল। নিজের রাজত্বে সৈন্যবাহিনীকে সজ্জিত ও প্রস্তুত করে

রেখেছিল। ঠিক বিপদের মুহূর্তটিতে যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে শত্রুর বুকে।

শিবাজী নিজে আসে নি। পাঠিয়েছিল তার অন্তরঙ্গ সহচর ও প্রধান সেনা রঘুনাথকে।

সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন চন্দ্ররাও। সুবাসিত জল আতর এবং ফুলের প্রচুর ব্যবস্থা করেছিলেন। দরবার লাবণ্যে গন্ধে এমন মনোরম করে রেখেছিলেন যেন প্রবেশ করেই যুদ্ধদীপ্ত হৃদয় শীতল হয়ে যায়।

রঘুনাথ বলেছিল, মারাঠাদের শোচনীয় অধঃপাতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শিবাজী চাইছেন মারাঠাজাতির অভ্যুত্থান। তাতে আপনার সহযোগিতাও অবশ্য প্রয়োজন।

লাভ?

টুকরো টুকরো শক্তিগুলি একত্রিত করলে কী দাঁড়ায় মহারাজ চন্দ্ররাও? এ-ও ঠিক তাই। ছোট ছোট অংশে শতবিভক্ত হিন্দু নরপতিরা। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। সবাই সর্বদা ভাবছে এই বুঝি আমাকে আক্রমণ করে বসল। ফলে কেউ শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। আর দেশে চিরকাল যুদ্ধ লেগে থাকলে সমৃদ্ধি আসবে কখন? সবাই একমাত্র শাসনের ছত্রছায়ায় মিলিত হলে তখনই নিশ্চিন্ততা কামনা করতে পারে প্রজাবৃন্দ, এমন কি নৃপতিরাও। হিন্দুধর্মের আদর্শ একবার স্মরণ করুন মহারাজ।

রঘুনাথ সুরচিত গোঁফে আতর ঘষছিল কথার ফাঁকে ফাঁকে।

চন্দ্ররাও বলল, অত্যাচার অবিচার কি হিন্দু রাজত্বে হয় নি? না হবে না?

আর যাতে না হয় সেই জন্যই তো এই চেষ্টা। সেই জন্যই তো নতুন আইন, নতুন কানুন রচনা করছেন শিবাজী।

চন্দ্ররাও কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর উঠে পড়লেন দরবার থেকে। কোমরবন্ধ থেকে টেনে বের করলেন দীপ্ত তরবারি।

খিলানে ঝুলন্ত দ্রাক্ষাকুঞ্জেই কোপ বসালেন সহসা। ঘুরে দাঁড়ালেন।

বললেন, সবাইকে পায়ের তলায় পিষে, নিজে বড় হবার মতলবটি ভালোই উদ্ভাবন করেছে তোমার প্রভু! না না···পায়ের ধুলো খেয়ে চন্দ্ররাও বেঁচে থাকতে পারবে না। শিবাজীকে গিয়ে বল, চন্দ্ররাও তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে।

তাতে ফল কি ভালো হবে মহারাজ?

চন্দ্ররাও চেঁচিয়ে উঠলেন, সে বিবেচনা আমি করব? দস্যুচরের মুখ থেকে আমাকে আমার ভালোমন্দ জানতে হবে কি?

অবজ্ঞায় ঘৃণায় চন্দ্ররাও-এর বিরাটাকার ব্যাঘ্রসদৃশ মুখ তখন বীভৎস হয়ে উঠেছে।

এত বড় অপমানেও সুস্থির ছিল রঘুনাথ। শান্ত কণ্ঠে বলেছিল, আজকেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে হবে এমন সর্ত নেই মহারাজ, আপনি দু চার দিন সময় নিতে পারেন। এর মধ্যে চিন্তা করুন ভালো মন্দ দুটো দিকই।

চন্দ্ররাও উত্তেজিত গলার স্বর যথাসম্ভব উঁচুতে চড়িয়ে বলেছিল, সীমানা ছাড়িয়ে গেছে রঘুনাথ। তোমার সঙ্গে কথা আমার ফুরিয়ে গেছে। তুমি যেতে পার।

এতক্ষণে রঘুনাথের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলল গম্ভীর কণ্ঠে, আতি-থেয়তা ভুলে যাচ্ছেন মহারাজ।

আর একটিও কথা নয়···আর একটি কথা আমি শুনতে চাই না। চন্দ্ররাও-এর গলা একেবারে খাদে।

যাচ্ছি···বলল রঘুনাথ, দাঁড়াল উত্তরীয় কাঁধে তুলে, কিন্তু যাওয়ার আগে আপনার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাব।

চন্দ্ররাও সঙ্গে সঙ্গে হেঁকেছিল, সিপাহী!

বলিষ্ঠকায় শান্ত্রী এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

বন্দী কর। পাঠাও কারাগারে।

চন্দ্ররাও-এর রক্ষী রঘুনাথকে বন্দী করার আগেই রঘুনাথ ভেরীধ্বনি করেছিল, আর অদৃশ্য প্রেতবাহিনীর মত কোথা থেকে শিবাজীবাহিনী দরবার আক্রমণ করেছিল। বেধে গিয়েছিল খণ্ডযুদ্ধ।

রঘুনাথের অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী হয়েছিল চন্দ্ররাও।

আতঙ্কে চীৎকার করে উঠেছিল বীরা। ভেবেছিল ওর চীৎকারে এগিয়ে আসবে দুর্গরক্ষীর দল। সমুচিত শিক্ষা দেবে রঘুনাথকে।

কিন্তু মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে ওর ভুল ভেঙে গিয়েছিল। চন্দ্ররাও-কে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে পারে এমন কেউ দুর্গ মধ্যে অক্ষত নেই। কারণ ততক্ষণে জাবেলী দুর্গ শিবাজীর দখলে চলে গেছে।

ভয়ে শিউরে উঠেছিল বীরাবাঈ। পালাবার জন্য পিছু হটতে শুরু করেছিল। সরে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। এমন সময়ে হাজির হয়েছিল পিতৃবন্ধু ঘোড়পুরে।

আমাকে বাঁচান চাচাজী।

তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই তো আমি ছুটে এসেছি মা। দুর্গের গুপ্ত পথ কি তোমার জানা আছে?

আছে।

তবে চল মা। সে পথ ধরে পালাই।

কিন্তু···

কিন্তুর সময় নেই মা।

কেন,—বিজাপুর সুলতান যে অসংখ্য সৈন্য দিয়ে বাবাকে সাহায্য করার জন্য বাজী শ্যামারাওকে পাঠিয়েছিল, তারা কোথায় চাচা। তারা কি এসে পৌছয় নি?

ব্যঙ্গের হাসি হাসল ঘোড়পুরে। বলল: তারা সব পথেই শেষ হয়ে গেছে। মাওলা সৈন্যদের হাতে অধিকাংশই প্রাণ হারিয়েছে। যারা বেঁচে ছিল তারা প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

আমাদের দুর্গরক্ষীরা? তারাও কি এত সহজে হেরে গেল?

শিবাজীর বুদ্ধির কাছে সবাই হেরে যাচ্ছে মা। চল মা, পা চালিয়ে চল।

শুধু প্রাণের মায়ায় ছুটে পালিয়েছিল বীরাবাঈ। জাবেলী দুর্গের গুপ্ত পথ ধরে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ের সানুদেশ। পাশেই ঝোপ ঝাড়, দিকচক্রবাল পর্যন্ত প্রসারিত।

কোথা থেকে কি ভাবে কে জানে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন নারী। শিবাজীর চর।

বীরাবাই।

কে?

আমি শিবাজী-সহচর তানাজী কন্যা।

কি চাও তুমি?

রৌদ্রঝলসিত তলোয়ারের মত সোজা দাঁড়িয়েছিল বীরাবাঈ।

আমার কিছু কথা আছে বীরা।

কি কথা? আমার পিতাকে হত্যা করেও কি তোমাদের রক্ত-সাধ মেটেনি? কোথায় পালিয়ে যাচ্ছি সে গোপন খবরও জেনে নিতে পাঠিয়েছে ঐ নরপিশাচ?

ছিঃ! বীরা, আমি তোমাদের গোপন খবর সংগ্রহ করতে আসি নি। আমি এনেছি এক প্রস্তাব, খুবই ভদ্রজনোচিত, খুবই মানবিক। তোমাকে আশ্রয় দিতে চান শিবাজী।

উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল বীরাবাঈ।

বলল, তোমার মহারাজকে বলে দিও তানাজী কন্যা, চন্দ্ররাওকে হত্যা করা যায় গুপ্তঘাতক লাগিয়ে কিন্তু তার মেয়েকে পাওয়া যায় না চর পাঠিয়ে। দরকার হলে ঐ পাহাড় চূড়া থেকে গভীর খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ব তবু নারীর ইজ্জত বিসর্জন দিতে তোমার প্রভুর ফাঁদে ধরা দেব না।

কী তুমি বলছ ভাই বীরা! শিবাজীকে তুমি জান না। তার হাতে নারী কোনদিন লাঞ্ছিত হয়নি, হবেও না।

বীরার কণ্ঠ বিদ্রূপ করে উঠেছিল: ছলনাময়ী, তোমার ছলনা চন্দ্ররাওয়ের কন্যাকে ভোলাতে পারবে না। সে তোমার চেয়ে কম শেয়ানা নয়।

গর্বিত পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল বীরাবাঈ।

বীরা, আমার কথা শোন। ভুল কর না।

ভুল আমি করছি না। তুমি ফিরে যাও।

দুর্গের বাইরে পরিখার পর পরিখা অতিক্রম করে এগিয়ে চলল বীরাবাঈ। পেছনে রেখে গিয়েছিল অসংখ্য পাহাড়, অগুন্তি চড়াই-উৎরাই।

শত্রুর লোভাতুর হাত থেকে বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ কোন মিত্রের অলকাপুরীতে ওকে রেখে গিয়েছে পিতৃবন্ধু।

মনে আছে দুর্গের বাইরে আসতেই ও বলেছিল, বাবার সৎকারের কী হবে চাচাজী?

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সেনানীর সৎকার হয় না মা।

বাবা তো শুধু সেনা নন, জাবেলীর সর্বময় অধিপতি।

কিন্তু এখানে তিলমাত্র সময় অপেক্ষা করা সঙ্গত হবে না মা। এখন নিজেদের জীবন তোমার বাবার সৎকারের চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। নয় কি মা? নিজে বাঁচলে তবে তো হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে।

বীরাবাঈ-এর মনে ধরেছিল ঘোড়পুরের পরামর্শ। ঘোড়পুরেকে অনুসরণ করে চলে এসেছিল আদিল শার সুরম্য প্রাসাদে। প্রাণ বেঁচেছে ঠিক, কিন্তু নারীত্ব যে বাঁচাতে পারবে এমন মনে হচ্ছে না। আদিল শার নজর যে বীরাবাঈ-এর নধর নিটোল কুমারীত্বের দিকে। ইতিমধ্যে কতবার দূতী পাঠিয়েছে আদিল শা ওর মন জানবার জন্য।

আদিল শার আশ্রয়ে সসম্মানে নির্ভয়ে দিনাতিপাত করবার আশা

এমন ভাবে ভেঙে যেতে বসবে কে ভেবেছিল আগে। কে ভেবেছিল যে, সুলতান তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার শপথ গ্রহণ করেছিল অন্য এক দুরভিসন্ধি মনে পুষে রেখে।

এখন তো আর সুলতানের কার্যকলাপে চন্দ্ররাও হত্যার প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা দেখতে পাচ্ছে না বীরাবাঈ? কোথায় গেল সুলতানের ক্রোধ? কোথায় হারাল সুলতান শিবাজীকে সমুচিত শিক্ষা দেবার সাধনা?

হারেমের বাঁদীরা মাঝে মাঝে এসে শুনিয়ে যায় শিবাজীকে জব্দ করার কাল্পনিক কাহিনী। শুনিয়ে যায় সুলতানের নতুন নতুন নিষ্ঠুর কৌশল যাতে শিবাজীর অবস্থা এবার অচিরে সঙ্গীন হবেই হবে। বীরবাঈ মনে মনে হাসে আর কাঁদে। হাসে এদের নির্বুদ্ধিতা দেখে। কাঁদে তার বিপদ অনুভব করে।

গত রাত্রে এসেছিল এক বাঁদীসর্দারনি। সেই একই ঘৃণ্য প্রস্তাব নিয়ে।

বলেছিল, আদিল শাহর মন তোমার জন্যই উতলা ভাই বীরা। সেই জন্যে শত্রুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়তে পারছে না সুলতান।

বাজে কথা বন্ধ কর লুৎফা।—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে শাসিয়েছিল বীরাবাঈ।

দমে নি লুৎফা। যার পেছনে সুলতানের কায়া, সে কি দমবার পাত্রী। বরং নতুন উদ্যম নিয়ে বলেছে, দেখ ভাই বীরা, জাঁহাপনার একান্ত ইচ্ছে তোমাকে তার বেগমের তখ্‌তে বসান।

তোর কানে কানে বলেছে বুঝি?

বলেছেই তো। বিশ্বাস কর ভাই। সুলতান নিজের খাসমহলে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন। তোমায় তাঁর পঞ্চম বেগমের সম্মান দেবেন।

মুহূর্তে বীরাবাঈএর মুখের রঙ বদলে গিয়েছিল।

ভয় পেয়ে গিয়েছিল আদিল শার বাঁদী।

আর এক নমুনা : কথা মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে এসেছিল কানের ক[illegible] ছিল ঘনিষ্ঠতার হাসি।

সা[illegible]মাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি ভাই বীরা।

কোন কথা না বলে বীরা শুধু মুখ তুলল।

কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাবে, সেই দস্যুসর্দার আর এই দুনিয়াতে নেই।

এতক্ষণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল বীরাবাঈএর চোখে মুখে। সোজা হয়ে বসল। ওর মুখের রেখায় রেখায় ছড়িয়ে পড়ল হাসির দীপ্তি। সব রাগ সব ক্ষোভ যেন হারিয়ে গেল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়েছিল লুৎফার কাছে।

সত্যি বলছিস ভাই? সত্যি কি শিবাজী নিহত হবে?

একটি অক্ষরও বানিয়ে বলছি না ভাই বীরা। আজ রাতেই বিজাপুর রাজ্যের সেনানী-প্রধান আফজল খাঁর হাতে প্রাণ হারাবে শিবাজী।

উৎফুল্ল হয়েছিল বীরা। বোনের আদরে জড়িয়ে ধরেছিল লুৎফাকে।

কিন্তু শিবাজীর সঙ্গে পেরে উঠবে তো আফজল খাঁ?

কেন পারবে না?

শুনেছি শিবাজী ভয়ানক ধূর্ত।

আফজল খাঁও বুদ্ধিতে কম যায় না বীরা। তাছাড়া সাহস এবং রণকৌশলেও তার জুড়ি নেই বিজাপুরের সেনাবাহিনীতে। এরই মধ্যে সে তুলজাপুর আর পুরন্দর কেড়ে নিয়েছে শিবাজীর কাছ থেকে। সে জানে সম্মুখ সমরে শিবাজীকে কাবু করা যাবে না। তাই সন্ধির নাম করে একটি গোপন জায়গায় ডেকে এনে হত্যা করা হবে।

সাবাস! বীরাবাঈ উল্লসিত হয়ে উঠেছিল।

আমি জাঁহাপনাকে কি বলব বল। প্রশ্ন করল লুৎফা।

কি আবার বলবে!

তোমার মতামত তো জানাতে হবে তাঁকে'। কে ভেবেছিল আবার সেই কদর্য আলোচনা! তুমি না নারী? করেছিল অসহায় অবস্থা কি তোমারও নয়? তুমি এ প্রস্তাব কি করে আস আমার সামনে?

মূক হয়ে গেল লুৎফা খানিকক্ষণ। এক সময় বলল, বড় নরম জায়গায় আঘাত করেছ ভাই বীরা। আমার অবস্থা তো জান তুমি। আমার কাজ দূতীয়ালি করা। তাঁর প্রস্তাব যদি তোমার কাছে পেশ না করি তাহলে আমার কী হাল হবে, নিশ্চয় তা কল্পনা করে নিতে পারছ। জানোই তো, এখানে কর্তব্যে অবহেলা মানে জীবন্ত কবর সঙ্গে সঙ্গে।

তাই বলে নারী হয়ে তুমি অন্য নারীর সর্বনাশ করবে?

উপায় নেই ভাই। বললাম তো সর্বনাশ করাই আমার পেশা।

এই তোমার পেশা! কী কুৎসিত তোমার পেশা!

এর জবাব ওই শাহজীর দিকে তাকালেই পেয়ে যাবে ভাই। শিবাজীর পিতা শাহজীর পেশাই কি সৎ বলতে পারবে? তিনিও তো নিঃশব্দে তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন।

চুপ করে গেল বীরাবাঈ। সত্যিই-তো, শুধু নিছক কর্তব্যের খাতিরে শাহজী আজ তার নিজের পুত্রের বিরুদ্ধে। শাহজী সুলতানের কর্মচারী। শিবাজীর শত্রু সুলতান। কিন্তু শাহজী তো শিবাজীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারছেন না? কারণ কর্ম, পেশা, কর্তব্য।

লুৎফাও কর্তব্যের শেকলে বন্দিনী।

মরিয়মের ঘৃণাঝরা দৃষ্টির সামনে থেকে সবে মাত্র বেরিয়ে এল রণদুল্লা খাঁ। অতৃপ্ত আগুন বুকে চেপে অবরুদ্ধ আক্রোশ দমিত করে'।

জলসাঘরের অলিন্দ ছেড়ে ঘরে এল মরিয়ম। ফেলল স্বস্তির নিঃশ্বাস। এর নাম কি সুলতানশাহী? এই কি সুলতানী শাসনের

আর এক নমুনা। শুধু মদ্যপ আর কামার্ত মানুষের উচ্ছৃংখলতা? কানের কাছে কেবল দেহদানের লোলুপ আবেদন? আদিল শার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে রণদুল্লা, আবার তার সঙ্গে পাল্লা নিয়ে চলছে হয় ত সিপাহীরাও।

এতকাল আভাস আর ইঙ্গিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল রণদুল্লার লোভ। কিন্তু ইদানীং ওর দেহ লক্ষ্য করে বড় বেশী এগিয়ে আসতে শুরু করেছে রণদুল্লা। কী করে জানতে পেরেছে আজ জলসাঘরের আসর বন্ধ। ঠিক সময় বুঝে চুপিসারে এসে হাজির।

মরিয়ম বাঈজী!

সৌজন্য রক্ষা করতে মরিয়মকে সহাস্যে বলতে হয়েছে, জী হুজুর ফরমাইয়ে।

তোমাকে আমার মহব্বত দান করতে এসেছি বাঈজী।

কানের মধ্যে ফুটন্ত জল কেউ ঢেলে দিল মরিয়মের। দু হাত পেছনে সরে গেল ও। দু জনের মাঝখানে খানিকটা দূরত্ব সৃষ্টি করল।

ব্যবধান ঘুচিয়ে কাছে এল রণদুল্লা খাঁ। স্বরে আবেগ মিশিয়ে ডাকল, মরিয়ম। বাঈজী সাহেবা! তারপর মুক্তোর একছড়া সাতনরী হার ছুঁড়ে পরিয়ে দিল মরিয়মের গলায়।

তৎক্ষণাৎ মরিয়ম গলা থেকে হার খুলে নিয়ে বলল, তুমি এ কী বলছ খাঁ সাহেব!

মরিয়ম জানে, হারগ্রহণ করা মানে দেহদানে সম্মতি জানানো।

বাক্যহারা মরিয়ম যেন ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। সে সুলতানের প্রিয় বাঈজী। তার কাছে সামান্য একজন সেনাপতি এমন প্রস্তাব করবে আশা করে নি মরিয়ম।

রণদুল্লা তখন প্রমত্ত। প্রেমে ও মদে। দু হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিল যৌবনের কাছে।

বাঈ সাহেবা!

তুমি না আদিল শার বিশ্বস্ত সৈন্য! তোমার উপর না অর্পণ করা হয়েছে বিজাপুর রক্ষার দায়িত্ব!

কিন্তু মরিয়ম, কলিজার খুন যদি মরুভূমির বালি হয়ে যায় তবে কেমন করে এত বড় দায়িত্ব পালন করব?

রণদুল্লার ঘোলাটে নজর, অসংযত পদক্ষেপ, এগিয়ে আসার ভঙ্গি দেখে মরিয়মের বুদ্ধি যেন লোপ পেতে বসল। বহু বিপদের মুখোমুখি হয়েছে মরিয়ম, কিন্তু সে সব থেকে উদ্ধার পেয়েছে চিন্তা করে মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। বরাবরই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে মরিয়ম বিপদ কাটাতে পেরেছে।

সাতাশ বছরের জীবনে কতবার যে রণদুল্লাদের পরাস্ত করেছে তার পরিসীমা নেই।

রণদুল্লা কিছুক্ষণ গাছের মত স্থির দাঁড়িয়ে মরিয়মের মৌনতাকে ধরে নিল প্রশ্রয় বলে।

মরিয়মও সেনাপতির সম্মানার্থে সরে যেতে পারছিল না। ভাবছিল কী করে।

শেষে বলল মরিয়ম ফরাস দেখিয়ে, বস খাঁ সাহেব।

একগাল হাসি ছিরিয়ে রণদুল্লা বলল, বসব?

পাঁচ পলক বসলে কি আমার গা ক্ষয়ে যাবে খাঁ সাহেব। তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

সুবোধ বালকের মত তখখুনি মরিয়মের আজ্ঞা পালন করল রণদুল্লা। পরবর্তী হুকুমের অপেক্ষার ভঙ্গিতে হাঁটু ভেঙে বসল, যেন বান্দা।

রণদুল্লা ঝিমোচ্ছে, তার বিরাট শরীর কাঁপছে বিশ্রামরত কুকুরের জিভের মত।

তুমি কি জান, বিজাপুরে তোমার কোথায় স্থান?

জড়িত কণ্ঠে বলল রণদুল্লা, জানি, একজোড়া খুবসুরত পায়ের কাছে…

তুমি জান না রণদুল্লা, তাই ও সব আবোল তাবোল বকছ। এত বড় রাজ্যের মাথার মালিক তুমি, পায়ের কাছে তোমার জায়গা কেন হবে?

রণদুল্লার মুখে চিন্তার ছায়া ভাসল। হয় তো মরিয়মের ভুল, হয় তো ঠিক। রণদুল্লা লাল চোখে পাথরের নকসা, দেওয়ালে বর্ণবহুল তসবির, গম্বুজের কারুকাজ আর খিলানের সৌকর্য দেখতে লাগল। অর্থহীন দেখা যেন।

বলল, সাধারণ সৈনিক আমি, সামান্য যোদ্ধা, কেন আমাকে পরিহাস করছ মরিয়ম।

নিজেকে বড় ছোট করে দেখছ খাঁ সাহেব। সত্যিই অনেক উঁচুতে তোমার আসন। তোমার অঙ্গুলি সঙ্কেতে হাজার হাজার সৈনিক কামানের গোলার সামনে ঝাঁপ দেয়। তোমার হুকুমে সেনা-বাহিনী পরিচালিত হয়। তোমার বুদ্ধির উপর নির্ভর করছে গোটা বিজাপুরের জীবন। আর তুমি কিনা এসেছ অখ্যাত এক বাঈজীর দেহ ভিক্ষে করতে?

রণদুল্লার মনে সন্দেহ জাগল, এত প্রশংসার কী প্রয়োজন। আবার, সন্দেহ-কুয়াশার মধ্য থেকে ভেসে উঠল আত্মগরিমা…যথার্থ বলেছে বাঈজী। অসংখ্য বালুকণার স্তূপে সে তুচ্ছ এক বালুকণা মাত্র নয়। একটি উজ্জ্বল স্বর্ণরেণু!

গন্ধসারের পাত্রটি একেবারে উপুড় করে নিজের মাথায় ঢেলে দিল রণদুল্লা খাঁ। শেষ ধারা থেকে এক আঁজলা ধরে ছিটিয়ে দিল মরিয়মের যৌবন লক্ষ্য করে।

জরুর! আমার কব্জির জোরে বিজাপুর তলোয়ার ধরে, আমার বিক্রমে বিজাপুর আওরঙ্গজেবের বান্দা হয়ে যায় নি। আদিল শা! ফুঃ! আমি না থাকলে ওই বিল্লিটাকে কবে চ্যাপ্টা করে দিত, শিবাজী আওরঙ্গজেব সবাই। তুমিই বল মরিয়ম, ঠিক বাত বলি নি?

মনে মনে মজা উপভোগ করল মরিয়ম।

সেই কথাই তো বলছি। বাঈজীর পায়ে তোমার বীর্য নষ্ট কোর না খাঁ সাহেব।

না বিবিজান, ইয়ে বাত ঠিক নেহি। তোমার যৌবন আমার গায়ে লাগলে আমি আবার যবক হয়ে যাব।

বাঈজীর পেছনে ছুটলে তোমার কর্তব্যে অবহেলা এসে পড়বে রণতুল্লা। আর সুলতান যদি টের পান তুমি তার খাস বাঈজীর কুঠীতে যাতায়াত করছ, তাহলে যে দুজনকেই দোজখে (নরক) পাঠিয়ে দেবেন।

স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াল রণতুল্লা। ওষুধ ধরেছে তাহলে। খাঁ সাহেবের গায়ে যেন ছোবল বসিয়েছে মরিয়ম।

তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? বলল রণতুল্লা।

তোমাকে আমি ভয় দেখাতে পারি?

হ্যাঁ, তুমি ভয় দেখাচ্ছ। বেশ, ওই সুলতানকে কোতল করে সেই খুন তোমার মুখে মাখাব আমি, তবে আমার নাম রণতুল্লা খাঁ। তখন তোমার মধু আর ওই শয়তানটার খুন একসঙ্গে আমি পান করব...

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অদৃশ্য হল খাঁ সাহেব।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল মরিয়ম বাঈ।

নরক! এটা নরক। আর এই নরক সহ্য করতে পারছে না মরিয়ম। প্রতি পলে এখানে অনিশ্চয়তা ছটফট করছে। এখানকার বাতাসে মিশে আছে নির্মমতা, ত্রাস। কোথায় কখন কেমন করে যে এখানে কী ঘটবে, আল্লাও যেন বলতে পারেন না।

অন্যমনস্কতা ভাঙল এক নারী কণ্ঠে। লুৎফা কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

অন্ধকার আকাশের দিকে কী অমন তন্ময় হয়ে দেখছ মরিয়ম? আজ তো চাঁদ ওঠে নি। পরিহাস তরল কণ্ঠে বলল লুৎফা।

চাঁদ ছাড়া কি আর কিছু দেখবার নেই ?

তোমার শিল্পী মন তো, তোমরা কেবল চাঁদ আলো ফুল এসব দেখে বেড়াও।

লুৎফার কাছে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল মরিয়ম। মানুষের দেহের উষ্ণ স্পর্শ, উষ্ণ হৃদয়ের বড় প্রয়োজন এখন অনুভব করছে মরিয়ম। সব সময় মানুষের দূরে থেকে থেকে তার মন খাঁ খাঁ করছে। খুব কাছে একেবারে বুকের ভিতরে কেউ ঢুকে বসতে পারে না ?

তার মনের খবর কেউ রাখুক আর নাই রাখুক অন্যের খবর রাখতে ভালবাসে মরিয়ম। সেই অভ্যাসে প্রশ্ন করল, সুলতানের খবর কী লুৎফা।

খবর ভালো নয় বহিন।

কেন।

পুরন্দরের কাছাকাছি কয়েকটি গ্রাম নাকি তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে। দখল করেছে শিবাজীর সৈন্যেরা।

এ আর নতুন খবর কী লুৎফা।

আরও খারাপ খবর আছে। যে বিজাপুর সেনাবাহিনী যুদ্ধ করছিল সেখানে, তার থেকে একটা বড় অংশ যোগ দিয়েছে শিবাজীর সঙ্গে।

এ-ও আমার কাছে পুরনো খবর ভাই।

কি বলছ বাঈ সাহেবা ? এ খবর তোমার কাছে নতুন নয় ! আদিল শার রাজত্বে এ ঘটনা আর কোন দিন ঘটেছে বলে কেউ বলতে পারবে না।

তা পারবে না। আবার প্রজাদের উপর এত পীড়নও এর আগে কোনদিন হয় নি। নতুন নতুন কর চাপিয়ে নতুন নতুন আইন করে পীড়নের চাকা চালাচ্ছেন সুলতান।

বিস্ময় ভরা চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল লুৎফা নিষ্পলক।

মরিয়ম আগের কথার সূত্র ধরে বলতে লাগল : বানের জলে

গাঁ ভেসে গেল, কোন সাহায্য পেল না প্রজারা। মহামারীতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেল, সহানুভূতি দেখাল না কেউ। মড়ক লেগে শস্য নষ্ট হল, না খেতে পেয়ে লোক মরল, তখনও আদিল শা নির্বিকার থাকলেন। এর পরেও কি বলতে চাও লুৎফা, বিজাপুরের চাষীরা আদিল শার হয়ে লড়াই করবে ?

লুৎফার চোখে বিস্ময়ের ঘোর আরও গাঢ় হল। কি বলছে মরিয়ম ? আদিল শার হারেমে বসে আদিল শার বিরুদ্ধে প্রচার ! নাচের আসরে নিত্য নতুন ভঙ্গিমায় নাচের কসরৎ দেখিয়ে আদিল শাকে আনন্দ দিয়ে আজ ওরই বিরুদ্ধে সমালোচনা ?

লুৎফা অবিশ্যি জানে, নিজের চোখে দেখেছে, যখন বিজাপুরের কৃষকরা দল বেঁধে আদিল শার কাছে এসেছিল বানের জলে ফসল হারিয়ে। কিন্তু তিনি কি কোন সাহায্য দিয়েছিলেন ? দেন নি। দিতে পারেন নি।

আদিল শা সেদিন নিজের অক্ষমতার কথা প্রচার করতে একটু-ও কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

সত্যি কথাই তো বলেছিলেন আদিল শা। দেশ জুড়ে যেখানে অজন্মা সেখানে কি করে প্রজাদের মুখের সামনে খাবার তুলে ধরবেন রাজা।

কিন্তু প্রজাদের দুর্দিনে মাঠের অজন্মায়, বিদেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তো রাজা। বিজাপুরে অজন্মা মানি, ভারতবর্ষের অন্য সব রাজ্যেও কি অজন্মার হাহাকার !

লুৎফা উৎকর্ণ হয়ে শুনল মরিয়মের কথাগুলো। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মনে হল সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য ভাবনার গভীরে ডুব দিল।

তা ছাড়া···আবার ছেড়ে দেওয়া কথার সূত্র ধরল মরিয়ম, সেই অজন্মার দিনগুলিতে আমাদের খাদ্যবস্ত্রের কোন অসুবিধে হয়েছিল কি ? বাদশা বেগমরা কৃচ্ছ্রসাধনের কোন চেষ্টা করেছিল কি ? বন্ধ

ছিল কি জলসামহলের মদির আসর ? কী বল। আমার কথার উত্তর দাও লুৎফা।

কোন উত্তর নেই। মরিয়মের কথায় সত্যের কোন অপলাপ নেই। একটুও রঙ ফলানো হয়নি এ অট্টালিকার অতীত ইতিহাসের উপর। কিন্তু এই জলসামহলের ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় দাঁড়িয়ে বিজাপুর শাসকের সমালোচনা কি বেমানান নয়।

পরক্ষণে লুৎফার মনে হল, মরিয়ম এত ভাবে, এত চিন্তা করে সংসারের ভালো মন্দ নিয়ে ? পড়াশুনা খুবই করে জানে লুৎফা। দিনের বেলা মুহূর্ত সময় ও নষ্ট করে না বৃথা। বড় বড় বই পড়ে। পড়ে কোরানশরিফ। কিন্তু এতটা দরদ কি ভালো ? যদি কোন দিন কোন দুর্বল মুহূর্তে প্রকাশ পেয়ে যায় ?

লুৎফা নিজেই ভয় পেয়ে গেল। আদিল শাহের হৃদয়হীন মূর্তিটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

ধীরে ধীরে মরিয়মের কাছে গেল লুৎফা। বলল : বাইজী সাহেবা, আমার একটি কথা রাখবে ?

কি কথা ? পরম আদরে লুৎফাকে জড়িয়ে ধরল মরিয়ম : বল ভাই। অসঙ্কোচে বল।

আদিল শাহের এই হারেমে যত দিন আছ তত দিন এ রকম সমালোচনা কর না ভাই মরিয়ম। জাঁহাপনা শুনলে কোন ক্ষমা নেই।

তা জানি ভাই লুৎফা।

জানোই যদি কেন বলছ এ সব ?

আমি তো আর হাটে মাঠে বলে বেড়াচ্ছি না। বলছি তোমার কাছে। আমার ছোট বোন লুৎফাকে শোনাচ্ছি জাঁহাপনার কীর্তি কাহিনী।

আমাকে বিশ্বাস করলে কোন সাহসে ! আমি বেগমের বাঁদী। আমি যদি সব প্রকাশ করে দিই তাঁর কাছে ?

তা তুই পারবি না লুৎফা।

পারব না কি করে জানলে বাঈজী সাহেবা ?

আমি জানি তুইও আমারই মত। নিরুপায় হয়ে এখানে আছিস। তুইও কোন দিন অত্যাচারীকে সমর্থন করতে পারিস না।

এমন তেজোদৃপ্ত নারীকণ্ঠ সে কোনদিন শোনে নি আদিল শার হারেমে আসার পর। এখানে অনেক বান্দা আছে। আছে অনেক বাঁদীও। বান্দারা খোজা, বাঁদীরা রূপসী। তাই বলে অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই নেই কারুর। বান্দা ও বাঁদী উভয়েই সহ্য করছে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অপমান। আজ পর্যন্ত কোন লাঞ্ছনা বা অপমানের বিরুদ্ধে একটি কণ্ঠও গর্জে ওঠে নি, একখানি মুখও মুখর হয়ে ওঠে নি।

মরিয়মই ব্যতিক্রম এই সুরম্য প্রাসাদে। বাঁদী নয় বলেই কি ? বাঁদী হলে কি এত সাহস পেত মরিয়ম ? বাঁদী না হোক বাঈজী তো ! আদিল শাহের মনোরঞ্জনের জন্য ঘুঙুর তো ওকে পরতে হয় পায়ে। তবলচীর হাতের বোলের সঙ্গে তাল রেখে দেহের কসরৎ করতে হয়। শরীর যদি খারাপ থাকে, দেহ যদি অবশ মনে হয় তখনও রেহাই থাকে না জলসা মহলের আয়োজন থেকে। সুলতানের আদেশে নাচের ঘূর্ণি তুলতে হবে, সুর্মা চোখে জাগাতে হবে লোভ। দেহের রক্তকেও নাচাতে হবে সুলতানের হুকুমে।

সেই বাঈজী কিনা সুলতানের দোষগুলোকে দেখিয়ে দিচ্ছে একটার পর একটা, লুৎফার চোখে আঙুল দিয়ে। কী সাহস মরিয়মের ?

যে কথা মরিয়ম শোনালো সে কথা তো কত দিন ওর মনেও জেগেছে। কিন্তু প্রকাশ করতে পেরেছে কি ?

মরিয়মকে লক্ষ্য করে কি যেন বলতে যাচ্ছিল লুৎফা এমন সময় দরজার বাইরে থেকে বান্দার গলা ভেসে এল।

বাঈজী সাহেবা !

দরজার দিকে এগিয়ে গেল মরিয়ম।

কি বলছ মহম্মদ ?

সুলতান আসছেন। জলসার আয়োজন করুন।

সুলতানের তো আজ কোথায় যাবার কথা ছিল মহম্মদ। তিনি কি সেখানে যান নি?

না। প্রতাপগড় হাত ছাড়া হয়ে গেছে বলে মন খারাপ।

ওদের আলোচনা হয়তো শুনে থাকবে কিংবা মহম্মদ আগেই খবর দিয়ে এসে থাকবে, তবলচি আর সারেঙ্গীয়াকে। ওরা এসে হাজির হল।

সারেঙ্গীয়ার সেই করুণ মুখ, শূন্য চোখ, মন্থর চলা।

ধীরে ধীরে মরিয়ম বলল, মহম্মদ, জাঁহাপনাকে গিয়ে বল, তবলচী তৈরী সারেঙ্গীয়া অপেক্ষমান।

মহম্মদ চলে গেল।

মুখ চাওয়া চাওয়ি করল লুৎফা আর মরিয়ম।

আর দেরী করব না বাঈজী সাহেবা। নাচের পোশাক পরে তৈরী হয়ে নাও।—বলল লুৎফা।

তাই করল মরিয়ম। দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। যেখানে ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে নাচের পোশাক।

কিংখাবের পর্দা সরে গেল। ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে জলসামহল আলো করে। রংমহলের জাজিমে পা দিয়ে ঘুঙুর পরল মরিয়ম।

মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে আদিল শা। তবলায় হাত রেখে অর্জুন প্রসাদ অপেক্ষমান। কপালে গঙ্গা মাটির তিলক। গলায় দুলছে তুলসীর মালা। পরনে গরদের ধুতি, দেহ বেষ্টন করে চাদর। মুসলমান হারেমের কাছাকাছি এতকাল বাস করেও হিন্দুয়ানা গেল না লোকটার।

তবলচি বোল তুলল আস্তে আস্তে। সারেঙ্গীয়া সুরের মূর্ছনা বাতাসে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস :পেতেই মরিয়মের পায়ের ঘুঙুর বেজে উঠল। আসমানী ওড়নার গায়ে সলমা আর চুমকি ঝিকমিক করে

উঠল। ওড়না তো নয় যেন নীলাভ আকাশে অসংখ্য তারা ঝকমক করছে!

মণিপুরী নাচের ছন্দ চমক লাগিয়ে যেতে লাগল। তবলচির ও সারেঙ্গীয়ার মনে চঞ্চলতা সৃষ্টি করল।

মরিয়ম নেচে চলল খেপা ঝরনার মত। ঘুঙুরের বোল ফুটল ঝুম ঝুম ঝুমুর ঝুম....ঝুম ঝুম ঝুম, ঝুমুর ঝুম···

কিন্তু যাকে তুষ্ট করার জন্য এত আয়োজন সে কোথায়? তার দেহ পড়ে আছে আসরে কিন্তু চেতনা অনেক দূরে। নেশার দুরতিক্রম্য বাধা ডিঙিয়ে জলসামহলের আনন্দে গা ভাসিয়ে দিতে পারছে না।

নাচের তবু বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই তবলচির হাতের বোলের। সারেঙ্গীয়া যেন কান্নার রোল তুলেছে রংমহলের চৌহদ্দিতে।

আদিল শা আর্ত চীৎকার করে উঠল, সে নেই মরিয়ম, সে নেই।

সেই আর্ত চীৎকারে তাল কেটে গেল নৃত্যের। বেসুরো বেজে উঠল সারেঙ্গীয়ার যন্ত্র।

মরিয়মের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আদিল শা। নেশার ঘোরে অবশ হাত যেন প্রাণ পেয়ে মরিয়মের যৌবন বেষ্টন করতে চাইল।

একি করছেন জাঁহাপনা! একি করছেন!

মরিয়ম! মেরে জান, তুমি আমাকে শান্তি দাও। আমার বুকে হাত রাখ মরিয়ম। আমার বুক ভেঙ্গে গেছে।

কি হয়েছে জাঁহাপনা?

আফজল খাঁ নিহত হয়েছে মরিয়ম। তুলজাপুর আর পুরন্দরপুর হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমি পাগল হয়ে যাব, আমাকে শান্তি দাও। অন্তত আজকের রাতটা আনন্দ দাও।

এক চোখে হাসি আর এক চোখে সমবেদনা ফুটিয়ে মরিয়ম বলল: দুনিয়ায় সবই অনিত্য জাঁহাপনা···সবই অস্থায়ী। আফজল তো চিরকাল থাকতো না। কাজেই তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই।

শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লে বিজাপুরের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনি মাথা উঁচু করে দাঁড়ান জাঁহাপনা।

আবার দুটো হাত এগিয়ে দিল আদিল শা। অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে করুণাপ্রার্থীর সুরে বলল: আমাকে প্রেরণা দাও, আমাকে উৎসাহিত কর মমতাজ।

আমি মমতাজ নই জাঁহাপনা, আমি মরিয়ম।

তুমি মরিয়ম, তুমি মমতাজও। তুমিই বিজাপুরের মমতাজ। তোমার চাহনীর সামনে বনের সিংহ থমকে দাঁড়ায়। ঐ কটাক্ষে রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। বুঝতে পারছি না আমায় কে বেশী জখম করেছে, দিনকে দিন আমার পরাজয়, না তোমার অসহযোগিতা, আমি জানি না।

কাশ্মিরী গালিচায় সারা দেহ এলিয়ে দিল আদিল শা। দু খানা হাত টান টান করে পড়ে রইল। নিথর নিস্পন্দ।

ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে গেল মরিয়ম। মাথার কাছে বসল। সুরার ভাণ্ড আর রূপোর পাত্র সরিয়ে রাখল খানিকটা দূরত্বে।

বিড় বিড় করে উঠল আদিল শা। আহত সৈনিকের মত মাথা ঝাঁকাতে লাগল। একবার এ পাশ একবার ও পাশ।

আমার বুঝি সব গেল মরিয়ম, আমার বুঝি সব গেল!

কিছুই যায় নি জাঁহাপনা, কিছুই যাবে না। যুদ্ধে জয় পরাজয় থাকে। আজ কিছু আপনি হারাবেন, কাল তার দ্বিগুণ জয় করে নেবেন, এই তো যুদ্ধের রীতি।

সত্যি বলছ মরিয়ম? আমি পারব আবার হৃতদুর্গ পুনরুদ্ধার করতে?

পারবেন জাঁহাপনা, নিশ্চয় পারবেন।

মরিয়ম আশ্বাস দিতে লাগল প্রত্যয়ভরা গলায়।

আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে দোলাতে আদিল শা বলল: না মরিয়ম, আর পারব না। আফজল খাঁ যখন পরাজিত এবং

নিহত হয়েছে তখন আমিও পঙ্গু। আর পারব না বিজাপুর রক্ষা করতে।

বিড় বিড় করে আরও যেন কি বলল আদিল শা। কিছুটা স্পষ্ট কিছুটা অস্পষ্ট। তারপর যেন একবার উঠে বসতে চাইল। কিন্তু পারল না।

আপনি কি বসবেন জাঁহাপনা? তুলে দেব আপনাকে?

না মরিয়ম। একটু ভাবতে দাও। মুখ থুবড়ে ভাবলে হয় ত একটা কিনারা আমি পেয়ে যাব।

বলতে বলতে উঠে বসল আদিল শাহ। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় রইল। কাকে যেন খুঁজে বেড়াল নেশার ঘোরে।

মরিয়ম মাথার দিক থেকে পাশে এল: কাকে খুঁজছেন জাঁহাপনা?

আদিল শা টেনে টেনে বলল: মরিয়ম···

জাঁহাপনা!

আজ থেকে তুমি আর বাঈজী নও মরিয়ম।

মরিয়ম নিজেকে গুটিয়ে নিল সহসা।

কি হল?

কিছু হয় নি জাঁহাপনা।

আমি জানি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না। সত্যি বলছি মরিয়ম তোমাকে মাণিকের তাজ করে মাথায় পরে থাকব।

না—না জাঁহাপনা, আমার মনের সামনে আপনি ঐ পথ আমাকে দেখাবেন না। আপনার কাছে আমার একমাত্র আর্জি আমাকে আমার জায়গায় থাকতে দিন। আমি বাঈজী। আমার নৃত্য দিয়ে যে টুকু আনন্দ আপনাকে দিতে পারব ঠিক ততটুকু দিতে আমি কোন দিন কার্পণ্য করব না।

বেশ, বেশ, তাই দিও মরিয়ম। কিন্তু···

আদিল শা যেন ছটফট করতে লাগল। কি যেন ধরতে চাইছে, কি যেন বলতে চাইছে।

ধর্মের জয় সুনিশ্চিত এ কথা আমি বিশ্বাস করি জাঁহাপনা। মরিয়ম সান্ত্বনা দিল।

চকিতে সোজা হয়ে বসল আদিল শাঃ কি বললে মরিয়ম! আমার দুর্গপ্রাকারে বসে আমার সর্বনাশের কথা ঘোষণা করছ তুমি?

আদিল শাহের চোখে যেন আগুনের ফুলকি।

আপনার সর্বনাশের কথা তো আমি বলি নি জাঁহাপনা।

তবে কি বললে? ধর্মরাজ্য তো শিবাজী চাইছে। ধর্মের জয় মানে শিবাজীর জয়ই তো কামনা করলে মরিয়ম।

মরিয়মের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলা করে গেল। ধীর কণ্ঠে বললঃ আপনার ধর্ম নেই একথা কে বললে জাঁহাপনা। আপনি বিজাপুরের শাসক। বিজাপুরবাসীর ভালো মন্দের ভার আপনার উপর ন্যস্ত। আপনিও সে দায়িত্ব পালনে অহরহ সচেষ্ট। এই যে দায়িত্ব-বোধ, এই যে কর্তব্যনিষ্ঠা এটাই তো আপনার ধর্ম।

আকর্ণ হাসল আদিল শাহ। খুশি উচ্ছ্বসিত গলায় বললঃ বড় সুন্দর কথা তুমি বললে, বড় সুন্দর করে বোঝালে।

হাসল মরিয়ম। কথা বলল না।

রৌপ্যাধার যে খালি···

কসুর মাফ কিজিয়ে বাদশা।

মরিয়ম ফেনিল রূপোর পাত্র এগিয়ে দিল আদিল শার দিকে। ঘরে উপচে গেল অমৃত গন্ধ।

জলসা কি আবার শুরু হবে জাঁহাপনা?

না—মরিয়ম, আজ আর নয়। আজ আর মানুষের গলা গানের সুর কিছুই সহ্য হচ্ছে না।

তাহলে মহম্মদকে ডেকে পাঠাই?

মহম্মদ কি করবে?

আপনাকে বেগমের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

রূপোর পাত্র তুলে শেষ পানীয়টুকু নিঃশেষ করে আদিল শাহ বলল : তোমার কাছেই থাকব আমি।

না, জাঁহাপনা আমি বেগম নই।

বাঈজী, কিন্তু অর্ধ লক্ষ মোহরে কেনা।

কথাটা শেষ করেই তাকিয়াতে গা এলিয়ে দিল আদিল শাহ। চোখ দুটো বুঁজে এল।

মরিয়ম নিশ্চিন্ত হল। বেশিক্ষণ বেলেল্লাপনা সহ্য করতে হল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেগমের কাছে পাঠাতে পারবে আদিল শাকে। নিদ্রিত সুলতান যাবে বান্দাদের কাঁধে চেপে। জাগ্রত অবস্থায় যাদের স্পর্শও করে না।

হারেমের শেষ প্রান্তের ঘরে অধৈর্য হয়ে উঠেছে বীরাবাঈ। ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে পায়চারী করে কতক্ষণ সময় কাটে?

কোথায় সেই খবর? সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে খবর এখনও এসে পৌছাল না কেন?

লুৎফা ওকে মিথ্যা একটা আশ্বাস দিয়েছিল!

আচ্ছা! মরিয়মকে একবার ডেকে পাঠালে হয় না? ও নিশ্চয় গত রাত্রের খবর জানবে। শিবাজী যদি নিহত হয়ে থাকে রংমহলে আনন্দোৎসবের আয়োজন ওকেই করতে হবে। ওই তো আনন্দ বিতরণ করবে সুলতান ও তাঁর আমীর ওমরাহদের।

যদি নিরানন্দের খবর থাকে তাও জানে মরিয়ম। ও কি আসবে? এখন তো জলসার সূচী নেই। সময়-ও নয়। উপরন্তু এ অট্টালিকার কোনো ঘরে যাতায়াতে ওর কোনো বাধা নেই। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে।

আদিল শাহ ঐটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে তার জলসামহলের

বাঈজীকে। খোজা সঙ্গে নিয়ে যে কোন ঘরে সে যেতে পারে। যায়ও।

মরিয়মটা যেন কি রকম! ওর মন যেন এখানে নেই। আদিল শাহ বেঁচে থাকুক, এ কামনা ও যেন মেটেই করে না।

সুলতানের প্রতি ইদানিং বীরাবাঈও বিশেষ বিরূপ হয়ে উঠেছে। শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের লোকের জন্যেও।

দিল্লীর বাদশাহের ফরমান অনুযায়ী মোগল শাসনের অনুকরণে হিন্দুদের উপর জিজিয়া-কর বসিয়েছে আদিল শাহ। বিজাপুরের হিন্দুরা মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ।

মুসলমান চাষীদের কাছ থেকেও আদায় করছে নিত্য নতুন কর বিজাপুরের স্বাধীনতা বিপন্ন বলে। চাষীদের সে সব কর দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি নেই, তা ভেবে দেখার ফুরসৎ নেই সুলতানের। মুসলমান প্রজাদের মনেও অসন্তোষ জেগেছে।

আওরঙ্গজেবের নিত্য নতুন ফরমান আদিল শাহেরও মতলবকে সাহায্য করে যাচ্ছে। কোন কাফের মানে হিন্দুরা হাতী চড়তে পারবে না, পালকি ব্যবহার করতে পারবে না এ ফরমান জারী করেছে আওরঙ্গজেব। বিশেষ কোন উৎসবে কিংবা জরুরী প্রয়োজনেও দামী ঘোড়ার সওয়ার হতে পারবে না।

এ ফরমান বিজাপুর রাজ্যেও কার্যকরী হতে চলেছে।

পাশাপাশি দুই-ই চলেছে এক সঙ্গে। মুসলমান ও হিন্দুদের উপর কর, আবার হিন্দুদের উপর ফরমান। মুসলমানরাও শান্তিতে নেই। তাহলে কি মরিয়মের কথাই ঠিক। হিন্দু আর মুসলমান কিছুই না? কাফের আর যবন গৌণ? আসল হল ধনী আর দরিদ্র?

যতই ন্যায়ের স্বপক্ষে কথা বলুক মরিয়ম, ঐ মারাঠা বীরপুঙ্গবকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না বীরাবাঈ।

শুধু কি ওর পিতাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়েছে দস্যু? ওর আকৈশোর স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েছে।

শাক্তারাওকে ভালোবেসেছিল বীরা। সে ভালোবাসা আকস্মিক-ভাবে গড়ে ওঠে নি। সে ভালোবাসায় কোন ফাঁকি ছিল না। একটু একটু করে তাদের ভালোবাসা প্রবল হয়েছিল। তখনও কৈশোরের সীমানা অতিক্রম করে নি বীরা।

জাবেলীর রাজ প্রাসাদ সংলগ্ন অলিন্দে আপন মনে খেলা করত বীরাবাঈ। কোন কোন দিন একা, কোন কোন দিন সভাপরিষদবর্গের মেয়েরাও থাকত।

খেলছিল বীরা। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে। বাসায় ফিরছিল পাখির দল। সময়টা ছিল বৈশাখ মাস। কালবৈশাখীর ঝড় হঠাৎ ছুটে এসেছিল। দিগন্ত রেখা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল মেঘে। কেঁপে উঠেছিল অরণ্যভূমি। গাছের শাখায় প্রশাখায় ঘা খেয়ে তুরন্ত বাতাস অদ্ভুত এক শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল।

বীরার সাথীরা ছুটে পালিয়েছিল। একা পড়ে গিয়েছিল বীরা। চৌদ্দ বছরের সুন্দর মেয়েটি ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে চেয়েছিল প্রাসাদের দিকে। রেলিং টপকে পথ সহজ করতে গিয়ে শাড়ি আটকে গিয়েছিল শিকে। এ দিকে বীরা দেহের ভার ছেড়ে দিয়েছিল রেলিং-এর বাইরে। দেহ-ভারের সমতা রক্ষা করতে না পেরে ঝুলে পড়েছিল বীরা। আশ্চর্য! ওই পাতলা মসলিন ওর দেহভার রক্ষা করতে পেরেছিল ঠিক।

চীৎকার করে উঠেছিল বীরাবাঈ। কোথা থেকে ছুটে এসেছিল এক যুবক। তুহাতে তুলে নিয়েছিল ওর যৌবন আভাসিত শরীর। শুধু ডান হাতের বেষ্টনে জড়িয়ে বুকের কাছে চেপে ধরে বাঁ হাতে লৌহদণ্ড থেকে মুক্ত করেছিল ওর মসলিন।

এক পলক তাকিয়ে বীরা ছুটে গিয়েছিল প্রাসাদের বারান্দায়। সেখান থেকে আহ্বান জানিয়েছিল বীরাবাঈ।

হাসি মুখে এগিয়ে গিয়েছিল অপরিচিত যুবক।

বীরা প্রশ্ন করেছিল : আপনি কে?

আমি একজন জাবেলীর সন্তান, শান্তারাও।

আপনি আমাকে ধরে রাখলেন!

কোথায়।

পৃথিবীতে।

আমাকেও তুমি ধরে রাখলে—পৃথিবীতে।

শান্তারাও চলে গেলে সেদিন ঝড় থেমে গিয়েছিল।

মাঝে মধ্যে দেখা হয়েছে ওদের। অলিন্দে খেলতে খেলতে, পায়চারী করতে করতে কত দিন শুধু হাসির মাধ্যমে আলাপ করেছে। পরিচয় গাঢ় করেছে।

কতদিন জাবেলীর রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে শান্তারাও। কতদিন কুন্দন তোরণে ওরা ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

হঠাৎ একদিন কি যেন হয়ে গেল। শান্তারাও আসা বন্ধ করল। বীরা আর শুনতে পেল না শান্তারাওয়ের অশ্বখুরধ্বনি।

দোতলার গবাক্ষে ঠেস দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে থাকত বীরা। অলিন্দে পায়চারী করে বেড়াত। সজাগ রাখত কান ও চোখ। কিন্তু কোথায় শান্তারাও? লোক পাঠানো হল। সে লোক ফিরে এল। শান্তারাও নাকি কোথায় চলে গেছে।

একদিন কে যেন বলেছিল: শান্তারাও এখন অন্য মানুষ। শিবাজীর মাওলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

প্রথমটায় যেন বিশ্বাস করে নি বীরাবাঈ। লোকের পর লোক পাঠাতে শুরু করেছিল শান্তারাওয়ের খোঁজে। বরাবরই এক খবর—শান্তারাও নেই।

প্রতীক্ষার প্রান্তে একদিন এসেছিল শান্তারাও।

তুমি নাকি দস্যুবাহিনীতে নাম লিখিয়েছ শান্ত?

চিরদিনের নীলাভ চোখ দুটো যেন মুহূর্তের মধ্যে রক্তাভ হয়ে গিয়েছিল শান্তারাও-এর।

বলেছিল : শিবাজী যদি দস্যু হয়, আমিও দস্যু বীরা। দস্যুকে পরিত্যাগ করলেই পার।

তুমি কেন দস্যু হতে যাবে শান্তারাও? তুমি তো আমার সম্রাট। হঠাৎ নরম সুরে বলেছিল বীরা।

তোমার সম্রাট হতে পারব কিনা জানি না, কারণ আমি শিবাজীর আদর্শের দাসানুদাস।

ধৈর্য হারিয়েছিল বীরাবাঈ।

বলেছিল : শিবাজীর আদর্শ তো রাত্রির অন্ধকারে শত্রু শিবির আক্রমণ করে লুণ্ঠন, আর নারীদের উপর অত্যাচার।

তোমার প্রথম অভিযোগ আমি স্বীকার করছি। লুণ্ঠন আমরা করি। কিন্তু লুণ্ঠিত সামগ্রী রাজ ভাণ্ডারে জমা দিতে হয়। আর রাজ ভাণ্ডার গরীবদের জন্য।

না শান্তারাও, তোমাকে কতকগুলো মিথ্যে কথা শিখিয়েছে ঐ ডাকাত। কোন মানুষেরই ভালো চাও না তোমরা। ভালো চাইলে শত শত লোককে এভাবে খুন জখম করে বেড়াতে না।

শান্তারাও প্রতিবাদ করেছিল, খুন-জখম আমরা করি, কিন্তু কোন নিরীহ মানুষকে নয়। অত্যাচারী বাদশা ও সুলতান, আত্মসর্বস্ব সুবাদার কিংবা তাদের চরদের আমরা খুন করি।

আমার বাবা কি অত্যাচারী?

অত্যাচারীর সাহায্যকারী তো বটে।

তাঁকেও হত্যা করবে তোমরা?

তাঁকে সুলতান সুবাদার জায়গীরদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুরোধ করব।

যদি তোমাদের অনুরোধ তিনি না রক্ষা করেন?

তখন কি করা হবে সেটা শিবাজীই ঠিক করবেন। আমরা তাঁর আদেশ পালন করব শুধু।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল বীরাবাঈ।

তারপর বলল : আমার দিকে তাকিয়েও কি তুমি ঐ দল ছাড়বে না শাস্ত ?

দল ছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না বীরা। বরং আমাকে যদি ভালোবেসে থাক তাহলে তুমিও আমাদের বাহিনীতে যোগ দাও। আমরা নারী বাহিনী গঠন করছি।

তা হয় না শান্ত। দস্যুবৃত্তিতে আমার শ্রদ্ধা নেই।

বীরাবাঈয়ের উক্তির কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল শান্তারাও।

দেশপ্রেম ! মারাঠার স্বাধীনতা ! যত সব বুনো মোষের রাখাল !

খবরের জন্য উতলা হয়ে আছে বীরাবাঈ। সত্যি যদি আফজল খাঁর হাতে শিবাজী নিহত হয়ে থাকে তাহলে বীরাবাঈয়ের জীবনে আবার সেই দিনগুলো ফিরে আসবে। ফিরে আসবে শান্তারাও।

কিন্তু ওকে কি ক্ষমা করবে আফজল খাঁ ? শিবাজীকে হত্যা করার পর কি ওর অনুচরদের ছেড়ে দেবে ? শান্তারাওকে নিয়ে কী করবে আফজল খাঁ ? হত্যা ?

বন্দীও তো করতে পারে।

হে ভগবান, শান্তকে যেন খাঁসাহেব ছেড়েই দেয় !

ওর ঘরের নরম গালিচার উপর কখন যে মরিয়ম এসে পাশে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি বীরাবাঈ।

বীরা বহিন !

চমকে চোখ ফেরাল বীরা।

মরিয়ম সস্নেহে বলল : সুখবর আছে বীরা। ভীষণ সুখবর।

রুদ্ধশ্বাসে বীরাবাঈ অপেক্ষা করল।

মরিয়ম বলল : তোমার মুক্তির দিন এগিয়ে আসছে খুব দ্রুত।

আমি তো বন্দিনী নই ভাই।

মুক্তও নও।

বীরাবাঈ বন্দিনী না হয়েও বন্দিনী। পালিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। যাবেই বা কোথায়? কোথায় কে তাকে বিনা স্বার্থে আশ্রয় দেবে।

কি ভাবছো ভাই বীরা?

ভাবছি আমার অবস্থা কি হবে শেষ পর্যন্ত।

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপল বীরাবাঈ।

এদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, এখন আমাদের অবস্থার শুরু। কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল মরিয়ম। দরজার দিকে চোখ রেখে কি দেখল, কি ভাবল, বলল: তুমি বোধ হয় শুনেছ যে আফজল খাঁ নিহত হয়েছে।

অ্যাঁ। আর্তনাদ করে উঠল বীরাবাঈ। মুখ ওর মসীলিপ্ত এবং চোখ স্থির হয়ে গেল।

মরিয়ম সরে এল ওর দিকে। বীরা, বহিন—আমি জানি তুমি আজও পিতৃশোক ভুলতে পারনি। সে জন্যে শিবাজীর উপর তোমার রাগ। কিন্তু তুমি শুনে বিস্মিত হবে যে শিবাজী তোমার মর্যাদা রক্ষার জন্য আদিল শাহের কাছে চরম পত্র পাঠিয়েছে।

বিস্ময়ের শেষ নেই। শয়তানের কত রূপই না বীরাবাঈকে দেখতে হবে? কোনটা সত্য রূপ শিবাজীর কে জানে? পিতৃ-হত্যাকারী? না শুভাকাঙ্ক্ষী?

মরিয়ম বলে চলল: আমি স্বয়ং জাঁহাপনার কাছেই শুনেছি। শিবাজী লিখেছে চন্দ্ররাও-এর সঙ্গে ওর বিরোধ ছিল। কিন্তু তার মেয়ে বীরাবাঈ মহারাষ্ট্রের কন্যা। তার মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব মারাঠাবাসীদের। আদিল হারেমে কোন নারী তার সতীত্ব বজায় রাখতে পেরেছে বলে কোন নজির নেই। তাই বীরাবাঈ সম্বন্ধে ওদের আশঙ্কা। বীরাবাঈ আত্ম সম্মান নিয়ে যদি বাস করতে পারে তাহলে তো কথাই নেই…কিন্তু যদি ওরা কোনোদিন জানতে পারে

যে মারাঠা কন্যার নারীত্ব ধুলায় লুটিয়েছে তাহলে আদিল শাহ যেন চরম শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকে।

বীরাবাঈ এবার হতাশ হয়ে পড়ল। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। মোগল পাঠানদের মধ্যেও আজ ঐক্যের বড় অভাব। ওরাও যেন ক্রমশ হিন্দুদের মত হিংসুক হয়ে যাচ্ছে। নিজেদের ভিতর লড়াই করে শক্তির অপচয় করছে।

আচ্ছা, তুমি নিজে মুসলমান হয়েও, মুসলমানের উপর তোমার এত রাগ কেন? বীরাবাঈ প্রশ্ন করল।

আমার রাগ তো মুসলমানের উপর নয় বহিন। আমার রাগ বর্তমান মুসলমান শাসন ব্যবস্থার উপর। তুমি বোধ হয় জান না বীরা, আমি নিজে একজন গোঁড়া মুসলমান। আমি কোরানের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার চেষ্টা করি। কিন্তু যারা কোরানের অপব্যাখ্যা করে কোরানকে নিজেদের স্বার্থে লাগায় তাদের বিরোধিতা করি।

আদিল শাহ?

আদিল শাহ মানুষকে ভালোবাসার পরিবর্তে দুঃখের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তাই আদিল শাহ কাফের। জান বীরা···মরিয়মের চোখে আগুন জ্বলে উঠল হঠাৎ। মুখের রেখায় রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ···শুনেছ আওরঙ্গজেবের শেষ ফরমান?

না শুনি নি। কী ফরমান এল আবার।

আওরঙ্গজেব ফরমান পাঠিয়েছেন তাঁর সাম্রাজ্য থেকে নাচগান তুলে দিতে হবে। বন্ধ করতে হবে জলসা, আসর। গানবাজনা যে করবে তার দণ্ড নির্বাসন।

সে কী! আওরঙ্গজেব তো শুনেছি বিদ্বান। তাঁর এমন মতিভ্রম হল কেন।

মরিয়মের চোখের কোণে জল টলটল করছে। শৈশব থেকে

নাচগান তার সঙ্গী। জীবনের ওপর একটার পর একটা ঝড় বয়ে গেছে। জীবন থেকে মুছে গেছে আত্মীয় পরিজন। কত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কত লোকের সাহচর্যে এক জায়গা থেকে ছুটে যেতে হয়েছে আরেক অনিশ্চিত জায়গায়। কিন্তু নাচগান তাকে ছেড়ে যায় নি। সেও নাচগান ছাড়তে পারে নি। নাচগানের ভিতর সে বিলিয়ে দিয়েছে তার—একান্ত তারই দুঃখের সমুদ্র। এখনও নাচগানের মধ্যে রোজ বিলিয়ে দিয়ে চলেছে।

তার মত আরও কত দুঃখী নরনারী নাচগানের ভিতর তাদের মর্মান্তিক বেদনা ছড়িয়ে দিয়ে বেঁচে থাকতে পারছে। এ দুঃখীদের যে কী করুণ অবস্থা হবে কে জানে!

মরিয়ম বলল, দিল্লীর এ ফরমান গতকাল আদিল শার দরবারে পৌঁছে গেছে।

তুমি এখন কী করবে বোন।—মরিয়মের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল বীরাবাঈ।

নিজের কথা ভাবছি না বহিন। আমি ভাবছি অন্য গুণীদের কথা। হাজার হাজার গুণী শিল্পী না খেতে পেয়ে মরে যাবে মোগল রাজত্বে। আর আগামী দিনের মানুষগুলোর কাছ থেকে হারিয়ে যাবে আজকের ছন্দোময় নৃত্য···হারিয়ে যাবে হাজার হাজার বছরের সার্থক সুরসাধনা।

মরিয়ম দু'হাতে চোখ ঢাকল।

বীরাবাঈয়ের চোখও ছল ছল করে উঠল। বলল: এমন ফরমান কি করে দিল আওরঙ্গজেব?

কোন কোন কবি যে আওরঙ্গজেবের হৃদয়হীনতা নিয়ে গান লিখেছেন। কোন কোন নৃত্যশিল্পী যে নাচের মাধ্যমে তাঁকে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

তাতে কি?

তাঁকে যে চিনে ফেলবে মানুষ। চিনে ফেললে বিপদ।···আমরা

নেচে নেচে ঈশ্বরের ভজনা করি, গান গেয়ে ভক্তি নিবেদন করি, নাটক করে সত্যাসত্য বিচার করি। সে সব করতে দেবে না বাদশাহ।

তাহলে কি হবে বহিন। কি করবে তোমরা?

একটা আরজি তোমার কাছে রেখে যাব বীরা। আমি যদি কোন দিন হারিয়ে যাই, তখন যদি তুমি বেঁচে থাক, একটা কাজ শুধু করবে তুমি।

কি কাজ বহিন? কি করতে হবে আমাকে?

যদি শিবাজীর সত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় কোন দিন তখন যদি সুযোগ পাও তাহলে তাদের কাছে একটি আবেদন জানিও—তাঁদের রাজত্ব থেকে শিল্পকে যেন নির্বাসিত না করে। একটা জাতিকে জানা যায় তার শিল্পকলার চর্চা থেকে। কাজেই আজ থেকে হাজার বছর পরে আজকের যুগটাকে যদি কোন মানুষ জানতে চায় কি দিয়ে জানবে?

বাঈজী সাহেবা!

বল বহিন।

আমি বেঁচে থাকলে বলব। নিশ্চয় দেখব তোমাদের সাধনা যাতে না হারিয়ে যায়। শান্তারাওকে যদি ফিরে পাই আর ওর হাতে যদি ক্ষমতা থাকে, আমি তোমাকে তোমার সাধনাকে নির্বাসন থেকেও ফিরিয়ে আনব। তোমাকে আমিই বাঁচিয়ে রাখব। তোমার ধর্মকে আমি প্রতিষ্ঠা করব।

একটা তৃপ্তির হাসি খেলা করে গেল মরিয়মের মুখের উপর; বীরাবাঈয়ের এতটুকু আশ্বাস, তবু ওকে আনন্দ দিল।

মরিয়ম বলল: আমি যাই বহিন। আদিল শাহকে দিয়ে বিজাপুরের দাবী পেশ করাব দিল্লীর দরবারে।

বেরিয়ে গেল মরিময়।

চোখের আড়াল হতেই বীরাবাঈ মনে মনে বলল: বড় ভালো মেয়ে। সহজ, সরল। কিন্তু কে ঐ মেয়ে? আদিল শাহের রং-

মহলের মণিপুরী ফরাসে পা দুখানি নৃত্যচিহ্ন এঁকে দেয় রোজ—কিন্তু নাচের মুদ্রা অন্য কিছু ইঙ্গিত করে? সাধারণ মেয়ে বলে তো মরিয়মকে মনে হয় না?

ঢাকা শহরের কাছাকাছি ছিল বাসস্থান। বাবা ছিলেন মুসলমান ভূম্যধিকারী। অভাব ছিল না সংসারে।

মসলিনের সালোয়ার আর মখমলের ওড়নায় দেহ আবৃত করে মাদ্রাসায় যেত মরিয়ম। পড়াশুনা করত মন দিয়ে।

মাদ্রাসা থেকে ফিরে এসে আর একটি শিক্ষা গ্রহণ করত। আর একটি পাঠ নিত।—গান শিখত মরিয়ম, নাচও। শেখাত ইদ্রিশ আলি খাঁ। বড় দরদ দিয়ে শেখাত ওকে। নিজের অভিজ্ঞতা উজাড় করে তালিম দিত ছাত্রীকে। এক একটা গান শেষ হলে মেহেদীরাঙানো দাড়ি নাড়াচাড়া করতে করতে বলত: খুব ভালো গেয়েছিস বেটি। সারা হিন্দুস্তানে তোর নাম ছড়িয়ে পড়বে। তোর গানের রোশনী মাতোয়ারা করবে আশমান জমিন।

নাচ?

সে দৃশ্যও চোখের সামনে ভাসত ওস্তাদজীর। মাত্র তের বছরের মরিয়ম। এ বয়সের মেয়েদের যা অসাধ্য তাও শিখে নিয়েছে।

নাচের ঘূর্ণিতে তুফান তোলে ও। ওড়না ওড়ে, ঘুরে ঘুরে চমক লাগায় ঘাঘরার জরিদার সলমাচমক কিনার। লাল মখমলের কাঁচুলি দোলায়…কাঁপায়।—জ্বলন্ত অগ্নিশিখা যখন ঘুরে ঘুরে নাচে, সঙ্গে সঙ্গে বেজে চলে ঘুঙুরের শব্দ।

তবলচি তাল ভুলে যেত। রহিম খাঁর আঙুলের মিনেকরা মূল্যবান ধাতুর মিজরাব গুণগুণ সুর তুলতে ভুল করত সেতারের বুকে।

ধমক দিতেন ওস্তাদজী, কি হচ্ছে তবলচি, হিন্দুস্তানের সেরা বুলবুলকে পেছন থেকে টেনে ধরছ ?

আবার তবলায় বোল ফুটত। সেতার সুর ছড়াত। মরিয়ম তুলত নাচের উচ্ছ্বাস। ঘুঙুরের শব্দ বাজত ঘরের পরিধিতে।

এত তীব্র দ্রুততায় নাচত মরিয়ম যে দর্শকদের মাথা ঝিমঝিম করত কিছুক্ষণের মধ্যেই। দর্শকদের মনে হত যেন তারা মদ্যপান করেছে।

ওস্তাদজী দুজন তবলচিকে নাকচ করে দিয়েছিল মরিয়মের উন্নতির সঙ্গে তাল সামলাতে না পারার জন্য।

নাকচ না করে উপায়ও ছিল না। মরিয়ম যখন নাচত তখন ওর নাচের সঙ্গে তাল রেখে সঙ্গত করতে পারত না তবলচিরা।

প্রথমটায় বেশ ভালোই চালাত। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়।

ওস্তাদজীর নজর এড়াত না। বলেছিলঃ তোমার দম নেই হোসেন খাঁ।

হোসেন খাঁ জবাব দিয়েছিলঃ দম আমার ঠিকই আছে ওস্তাদজী। তবে আপনার শিষ্যা যে লাখে এক।

হ্যাঁ ওর দম একটু বেশী। অনেকক্ষণ ধরে নাচতে পারে।

হোসেন খাঁ বলেছিলঃ আমি অন্য চাকুরী দেখি গিয়ে।

আরও ক'টা দিন দেখে তারপর যেও। এর মধ্যে যদি দমটা বাড়িয়ে নিতে পার।

এর বেশী আর দম বাড়বে কি ?

কেন বাড়বে না। এখনও তিরিশের কোঠায় তোমার বয়েস।

টেনে টেনে লজ্জা জড়ানো হাসি হাসত হোসেন খাঁ।

কোথায় কোথায় বাজিয়েছ এর আগে ?

বাজিয়েছি লক্ষ্ণৌর মতিবাঈয়ের জলসায়।

কত দিন বাজিয়েছ ?

দশ বছর।

ছাড়লে কেন ?

মুখখানা বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল হোসেন খাঁর। ওস্তাদজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছিল ওর মুখের দিকে। শুধু কি মুখে ? মনে হয়েছিল তার দৃষ্টি বুকের পাঁজর ভেদ করে ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

এক সময় বলেছিল : কই বললে না তো ছাড়লে কেন ?

সে আমার নসিব ওস্তাদজী।

কপালে ডান হাত ছুঁয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছিল হোসেন খাঁ।

মহব্বতে মজেছিলে বুঝি ?

হোসেন খাঁর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠেছিল। কোন জবাব দেয় নি।

ওস্তাদজীর মেহেদীরাঙানো দাড়ি গোঁফের আড়ালেও এক টুকরো হাসি যেন খেলা করে গিয়েছিল সে মুহূর্তে। বলেছিল : লক্ষ্ণৌর কোন বাঈজীকে এতক্ষণ দম রেখে নাচতে দেখেছ ?

দেখি নি ওস্তাদজী।

ওরা পেশাদারী কি-না ?

হোসেন খাঁ চোখ তুলেছিল ওস্তাদজীর মুখে। কারণ সে বুঝে নিয়েছিল ওস্তাদজী কথাটা ঠিক বলে নি। পেশাদারী যারা তাদের দম এমন কিছু কম থাকে না। আসলে মতি বাঈয়ের অত দম ছিল না। অথচ সে একজন নামী বাঈজী। পশ্চিম ভারতে তার যথেষ্ট সুনাম।

তারপরেও কয়েকদিন দম রেখে সঙ্গত করতে চেষ্টা করেছিল হোসেন খাঁ। চেষ্টা করেছিল লক্ষ্ণৌ মতিবাঈএর সঙ্গতকারীর ইজ্জত রক্ষা করতে।

কিন্তু পারে নি।

আমি পরাজিত ওস্তাদজী, কাল থেকে আর আসব না।

কোথায় যাবে ?

অন্য কোথাও কাজ দেখব।

পাবে তো?

তা অবশ্য আপনার মেহেরবানীতে পেয়ে যাব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ পাবে। মতিবাঈএর সঙ্গতকারীকে তবলচি হিসেবে রাখতে পারলে অনেকেই তরে যাবে। আবক্ষ দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ওস্তাদজী বলেছিল: অনেক কাজ পাবে···মরিয়ম বেজোড়, ওর নাচের সঙ্গত করা মুশকিল।

তার প্রমাণ আমিও পেয়ে গেলাম ওস্তাদজী।

তারপর আর একজন এসেছিল। সেও দম রেখে বাজাতে পারত না শেষ পর্যন্ত।

তারপর যে এসেছিল তাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল নিরুপায় হয়ে। সে অবিশ্যি দম রাখতো, তবে সে রাখা চেষ্টাকৃত। মিঠে বোল বাজাতে পারত না, আর বাজাতে বাজাতে ঘামত সর্বদাই।

তাতে তার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

তাকে রেহাই দিয়ে গেল হার্মাদের একটি দল।

রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ আক্রান্ত হয়েছিল ওদের গ্রাম। বাড়ির পর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। লুটতরাজ চালিয়েছিল সারা রাত্রি সমানে।

লুণ্ঠিত সোনা দানা হীরে জহরতের সঙ্গে মরিয়মও অপহৃতা হয়েছিল। সঙ্গে আরও অনেক মেয়ে।

তাম্রলিপ্ত বন্দরে সকলকে জাহাজে তুলেছিল। পরদিন সকালে হস্তান্তরিত হয়েছিল এক বড় ব্যবসাদারের হাতে। ব্যবসাদার পণ্য করে পাঠিয়েছিল বাঁদীবাজারে। কাবেরীর তীরে।

বাঁদী বাজার! জীবন আর জহরতের পশরা। শত শত গ্রাম্য মেয়ের ভিড়। শত শত বাঈজী আর বারাঙ্গনা এসেছিল বিক্রয়ার্থে।

যে দিকে চোখ যায় শুধু তাঁবু। সারি সারি তাঁবু। চাঁদনি রাতে মনে হয়েছিল যেন ঘাসের গালিচায় অজস্র শুভ্র পালক-পরিকীর্ণ কপোত কপোতী।

লক্ষ্মী আর যোধপুরের বাঈজী, রাজস্থান আর আগ্রার রূপসী বারবধূর দল! বাংলা আর বিহারের রতিসঙ্গিনীর জমায়েত।

সারা ভারতের রাজা বাদশা, বিলাসী ভূস্বামী আর শক্তিমান ভুঁইয়ারা এসেছিল বিবিবাজারে।

ঘুরে ঘুরে খুঁজছিল জীবন্ত জহরত। ঘুরে বেড়াচ্ছিল রূপ যৌবনের সন্ধানে। মরিয়মকে একবার চোখে দেখলে তক্ষুণি তুলে নিয়ে যাওয়ায় তেমন কিছু বিচিত্র ছিল না। মাত্র দুদিন আগে ওকে বাঁদীবাজার থেকে বিবি-বাজারে চালান দেওয়া হয়েছে। বিবিবাজারে স্থান পেয়েছে একমাত্র রূপের জৌলুসের জন্যই। এ বাজারে দরটা বেশি।

শেঠের হাত থেকে বড় ব্যবসায়ীর হাতে গিয়ে পড়েছিল ও, কালো বোরখায় ঢেকে দিয়েছিল ওর রূপ যৌবন। চোখে লাগিয়ে দিয়েছিল সুর্মা।

ইতিমধ্যে দু'একজন খদ্দের দেখে গিয়েছিল ওকে। তাদের মধ্যে একজন দর দিয়েছিল মাত্র পঞ্চাশ মোহর।

কিন্তু ব্যবসায়ী সে দামে ছাড়ে নি। পঞ্চাশ মোহরে মরিয়মের মত রূপসীকে বিক্রী করবে না।

ওদিকে মরিয়মের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। হার্মাদের হাতে মৃত্যু হলেই ভালো হত। এত দুর্ভোগ পোহাত না। নানা দুশ্চিন্তায় আর দুর্ভাবনায় অস্থির হত না মন। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে মাথা খারাপ করতে হত না।

তৃতীয় দিন এসেছিল লক্ষ্ণৌর মতিবাঈ। নামজাদা বাঈজী।

দেখেই পছন্দ করেছিল ওকে। সত্তর মোহর কিম্মত দিতে স্বীকার করেছিল মতিবাঈ। তাও খুশী মনে।

কালো বোরখার আড়ালে মরিয়মের দুটো চোখ চিক চিক করে উঠেছিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল মতিবাঈকে। ওর যেন মনে হয়েছিল ঐ নামটি কোথায় শুনেছে। বড় যেন চেনা মনে হয়েছিল মুখখানা।

বোরখার আড়ালেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল মরিয়ম। তবু ভালো যে মতিবাঈ নিয়ে যেতে চাইছে। ওর কাছে যেতে পারলে বাঈজী হয়েই থাকবে। রাজ্যের কর্মচারীদের খোরাক হতে হবে না। কাঞ্চনী হতে হবে না।

শেষ পর্যন্ত মতিবাঈ কিনে এনেছিল ওকে।

বাঈজীর জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে শুরু করেছিল। শেখাতে শুরু করেছিল নৃত্য ভঙ্গিমা।

কিন্তু আশ্চর্য! এত অল্প বয়সে এত নাচের ভঙ্গি কি করে আয়ত্ত করলে এই মেয়েটি? মতিবাঈ বিস্ময় বোধ না করে পারে নি মরিয়মের ক্ষমতা দেখে।

অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল: তুমি কার কাছে নাচ শিখেছিলে মরিয়ম।

তাকে তো তুমি চিনবে না।

চিনব মরিয়ম। হিন্দুস্থানে যত বড় বড় গাইয়ে আছে প্রায় সকলের নাম আমি জানি। তুমি নাম বল।

ইদ্রিশ আলি খাঁ।

ইদ্রিশ আলি খাঁ! কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে নামটা উচ্চারণ করেছিল মতিবাঈ। স্মৃতির সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে ঐ নামটিকে যেন খুঁজে বেড়িয়েছিল। এলোপাথারি।

বয়েস হয়েছে! চুল দাড়ি পেকেছে!

বলেছিল মরিয়ম আগের কথার সূত্র ধরে।

পেয়েছি মরিয়ম। চিনেছি ওকে।

কি করে চিনলে?

সে যে এ সহরে গান শেখাত।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, বড় নাম করা গাইয়ে। বড় উঁচু দরের গাইয়ে। ওর কাছে গান শিখেছ তুমি?

হ্যাঁ, বাবা ওকেই রেখেছিলেন মোটা টাকার বিনিময়ে।

তাই বল। আমি তো ভেবে পাই না এ নাচ এ গান তুমি কোথা থেকে শিখলে?

এর বেশি কি শেখার নেই?

আছে মরিয়ম। অনেক আছে।

আমাকে শেখাবে না?

শেখাব তোমাকে সব শেখাব।

মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে তাই করেছিল মতিবাঈ। মরিয়মকে নাচ গান শেখাতে গিয়ে কোন দিন ক্লান্তিবোধ করে নি। ও ওর সাধনালব্ধ সব জ্ঞান মাত্র কয়েকটি মাসের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল মরিয়মের হৃদয়ে।

শিখিয়েছিল জলসার আদব কায়দা—জলসার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পোষাক বদলের কানুন। হাতের মুদ্রা চোখের ভঙ্গিমা সম্বন্ধেও জ্ঞান দিয়েছিলা।

মরিয়মও সমগ্র সত্তা দিয়ে মতিবাঈএর সব শিক্ষাদীক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে সংকল্প নিয়েছিল।

মতিবাঈএর সম্পদ, প্রতিপত্তি, আর খ্যাতি ওর মনে স্বপ্ন রচনা করেছিল। ওকে প্রলুব্ধ করেছিল!

মতিবাঈ বলেছিলঃ কোন বিত্তবানের মহব্বতের প্রলোভনে ভুলবি না মরিয়ম? ওদের মহব্বতের কোন দাম নেই। ওদের মহব্বত হল লালজলের নেশা। নেশা কেটে গেলেই দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সব জলসাতেই দু একটা মহব্বতের মানুষ জুটবে। তাদের কিছুতেই পাত্তা দিবি না।

অবজ্ঞা করব? তাহলে যে ভবিষ্যতে ডাকবে না?

ঠিক ধরেছিস মরিয়ম। অবজ্ঞা নয় মহব্বতও নয়। মাঝামাঝি থাকতে হবে।

তা কি সব সময় পারা যাবে?

তা না হলে মরবি। জীবন ভোর কাঁদবি। রাজা বাদশারা তোর আমার লালসায় আসক্ত হয়ে সর্বস্ব হারাতে প্রস্তুত তবু রাণী কিংবা বেগমের মর্যাদা দেবে না।

মতিবাঈএর উপদেশ মন্ত্রের মত নিজের মনে জপতে শুরু করেছিল সেদিন থেকে।

নরম গালিচার উপর পা টিপে টিপে একদিন মতিবাঈ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মরিয়ম !

সস্নেহ আহ্বানে চোখ ফিরিয়েছিল মরিয়ম।

মতিবাঈ মৃদু হাসির সঙ্গে বলেছিল ঃ তোর শিক্ষা শেষ হয়েছে। তারপর মুচকি মুচকি হেসেছিল—বলেছিল ঃ এবার তোমার ওড়না তোলার দিন এসেছে মরিয়ম।

আমার সঙ্গে কি তুমি যাবে না ?

যাব বই কি ! প্রথম প্রথম তোকে একলা ছেড়ে দিয়ে আমি কি নিশ্চিন্তে থাকতে পারব ?

তবু কেন কে জানে মরিয়মের মুখের উপর আশঙ্কার ছায়া দুলে গিয়েছিল।

ভয় পাচ্ছিস মরিয়ম ?

হ্যাঁ। আমি কি মাইফেলে যেতে পারব ?

পারবি। আমার জানা সব রাগরাগিনী সব মুদ্রা শেখা হয়ে গেছে, মজলিসী আদব কায়দা শিখিয়েছি। এখন যদি মুজরায় না যাস তবে কি রূপ যৌবন ঝরে গেলে যাবি ? বাঈজীর যশ তো এই বয়সেই বানাতে হবে।

এতক্ষণে সাহস পেল মরিয়ম। মুখের উপর থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া মুছে গেল।

মতিবাঈ বলেছিল ঃ তোর ঐ উঠতি যৌবন দেখেই ঘায়েল হবে দক্ষিণী সুলতান। তারপর তো বড় অস্ত্র রয়েছে নাচ আর গানের রোশনী।

সুলতানটি কে ?

বিজাপুরের শাসনকর্তা। লক্ষ্ণৌ এসেছে নাচগান শুনতে।

পরদিন নাচঘরে ঢুকেছিল মতিবাঈ আগে। কুর্ণিশ করেছিল সুলতানকে।

আরম্ভ কর মতিবাঈ।···নেশার ঘোরে বলেছিল আদিল শা।

আরম্ভ করলে শেষ হবে না সুলতান।

শেষ তো আমিও চাইনা মতিবাঈ।

তাহলে নতুন কণ্ঠের গান শুনুন।

নতুন কণ্ঠ, নতুন মুখ? উৎসাহে উজ্জ্বল চোখ তুলেছিল আদিল শা।

হ্যাঁ, হুজুর। নতুন মুখ, কিন্তু পুরানো বাঈজী মতিবাঈ হার মেনেছে এর রূপ যৌবন আর নাচ গানের কলাকৌশলের কাছে।

এত ?

হ্যাঁ এত।

বলেই ইশারা করল মতিবাঈ।

সঙ্গে সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে বিভোল নাচের মুদ্রায় আদিল শার সামনে এসেছিল মরিয়ম। তিলোত্তমা।

আদিল শার চোখ স্থির হয়ে গিয়েছিল। তাকিয়ে থেকেছিল বিস্ফারিত চোখে।

গোলাপী রেশমের ঘাঘরা—রেশমী জমিতে জরি আর পোখরাজের রোশনাই। গাঢ় লাল মখমলের কাঁচুলিতে যৌবনের অধীরতা। মুখের উপর রজত শুভ্র মসলিনের আবরণ। আদিল শাহ বিভোর হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিল। একেই কি বলে রূপ যৌবন!

মতিবাঈ সুলতানের পাশে বসে সজাগ করে দিয়েছিল। ফিসফিসিয়ে বলেছিল, ওড়না সরিয়ে দিন বাদশা। পহেলি মাইফেল আপনার হাতেই হোক।

আচ্ছা, বেশ বেশ। আজকেই পহেলি মাইফেল? বেশ। তো এ চীজ একদম আনকোরা?

সুলতানের চোখ থেকে লালসার আগুন ঝরছিল। নেশার ঘোরে উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে। মরিয়মের কাছে গিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে ওর ওড়না সরিয়ে দিয়েছিল।

পহেলি মাইফেলের কানুন নিশ্চয় জানেন বাদশা?

তুমি কি বলছ মতিবাঈ?

রাগবেন না বাদশা। মনে করিয়ে দিচ্ছি।

সে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। নতুন বাঈজীর মর্যাদা আমি আজীবন রক্ষা করব। দিলাম, এ জবান দিলাম।

মতিবাঈ আদিল শার হাতে সোনার আলবোলার নলটি ধরিয়ে বলল, আরও আছে। ঐ রীতি মানতে হলে মরিয়মকে আশ্রয় দিতে হবে—যতদিন না ও স্বেচ্ছায় আপনাকে ছেড়ে যায় ততদিন ওকে সসম্মানে আপনার হেফাজতে রাখতে হবে। দেখবেন বাদশা, আশ্রয় দানের সুযোগে ওর কৌমার্য ভেঙে দেবেন না।

তাই হবে মতিবাঈ, তাই হবে।

সেদিন মতিবাঈকে বড় বিষণ্ণ দেখিয়েছিল। সে তো নিজেই মরিয়মকে ঠেলে দিল নতুন আশ্রয়ে। মতিবাই তো স্বেচ্ছায় একটা মিষ্টি স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিল। তবে কেন মতিবাঈএর মুখের প্রচ্ছদপট থেকে মুছে গেল রক্তের আভা। তবে কেন সে আর ফেলতে পারল না স্বস্তির নিঃশ্বাস।

ঘুঙুরের বোল স্তব্ধ হলে মরিয়ম ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মতিবাঈএর কোলে।

যা বহিন। তুই বিজাপুরে চলে যা। তোর বিরাট জীবনের কথা ভেবে তোকে আমার সুখের ঘানি করতে পারলাম না রে। তুই শুধু চিরকাল আমার তেল পেষাই করবি? তোকে কি আমি দোকানঘর বানিয়ে বসব? বারোয়ারী বাঈজীদের যে কী যন্ত্রণা মরিয়ম, সে

আর তোকে কী করে বোঝাব ! সে জীবন তুই সহ্য করতে পারবি না বহিন। নিত্য নতুন রাজাবাদশা আমীর ওমরাহর ছোটলোকী আবদার, কামার্ত ব্যবহার তোকে দলে পিষে যা-তা করে ফেলবে। তাই তোকে সঁপে দিলাম আদিল শার হেফাজতে। আমার বিশ্বাস তিনি তোকে কাঞ্চনী হিসেবে দেখবেন না।

কিন্তু তোমার চোখে জল কেন ? কেন তুমি কাঁদছ ?

তোর মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি যে আগে থেকে।

সে তো খুশীর ব্যাপার। তাতে চোখে জল কেন আসবে ? আমার ভয় করছে মতিবাঈ : সব তোমার মিথ্যে কথা।

মতিবাঈকে মরিয়ম দু হাতে ভীষণ জোরে জড়িয়ে ধরেছিল। শেষ মাতৃত্বের স্পর্শ অনুভব করছিল মরিয়ম। কী গভীর বাঁধন কাটাতে বসেছে সে ! কেঁদে কেঁদে মতিবাঈএর কাঁধ ভিজিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

মতিবাঈ মরিয়মকে সুলতানের জলসাঘরে পাঠিয়েছিল একমাত্র নাচগানের জন্য। মরিয়মের নৃত্যগীত ক্রমান্বয়ে উন্নততর হবে। সুলতানের দরবারে অনেক গুণীজনের নিকট সংস্পর্শে আসতে পারবে। অতুলনীয় শিল্পী হতে পারবে মরিয়ম।

চৌষট্টি কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা নাচগান কিনা উঠে যাবে আদিল শার রাজত্ব থেকে। আওরঙ্গজেবের এই নিষ্ঠুর ফরমান নিশ্চয় অমান্য করতে পারবে না আদিল শা। নাচগানের জগত থেকে মুছে যাবে ইদ্রিশ আলি খাঁ, অর্জুন প্রসাদ, ওস্তাদ গাইয়ে ভগবত মিশ্র, মুছে যাবে মরিয়মবাঈ নিজে। নাচগানের সঙ্গেই যে ওতপ্রোত মিশে আছে এদের জীবন।

পহেলি মাইফেলের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অনুতাপে কি জর্জরিত হবে না আদিল শা ? আর জর্জরিত হলেই বা কী। বাদশা সুলতানদের খেয়ালখুশী যে প্রতি পলকে পালটাচ্ছে। প্রতি পলকে ওদের আদেশ, ওদের আইন বদলাচ্ছে। সামান্য এক বাঈজীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব ওদের কাছে আর কতটুকু ?

রোজ জলসাঘরের বেলোয়ারী কাচের হাজারো বর্তিকা নিভে গেলে, বান্দা ও বাঁদীর দল আড়ালে চলে গেলে, কেমন আচ্ছন্ন কণ্ঠে কথা বলে সুলতান। আবেদন নিবেদনের পালা শুরু হয়। চলে কিছুক্ষণ। শেষে ব্যর্থ হলে জোর জবরদস্তির পথ ধরে আদিল শা। মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরে' মরিয়মের যৌবন অপবিত্র করার চেষ্টা করে। এই তো সুলতানের প্রতিশ্রুতি রক্ষার নমুনা।

মরিয়ম বুদ্ধিমতী মেয়ে। নানা ছলাকলা প্রয়োগ করে রোজ ঠিক সে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু কত দিন? কত দিন সে সুলতানের অমিত বীর্যের কাছে তার দৈহিক স্বাধীনতাকে পারবে বাঁচিয়ে রাখতে?

দিনের পর দিন আদিল শার একই প্রস্তাব আসে বীরাবাঈএর কাছেও। বাঁদীদের মুখে আবেদন শুনে শিউরে ওঠে বীরা। গবাক্ষ পথে পরিখাবেষ্টিত দীর্ঘ প্রাচীরের দিকে তাকায়। দুর্গম দুর্গ থেকে বেরোতে পারে একমাত্র পাখীরা। কোন মানুষের সাধ্য নেই যে সুলতানের বিনা হুকুমে দুর্গের বাইরে যেতে পারে। নইলে কবে এখানকার পৈশাচিক আশ্রয় ছেড়ে পালাত বীরাবাঈ।

শিবাজীর চিঠিতেও আদিল শা যখন সংযত করল না নিজেকে, তখন বীরাবাঈদের আকুল প্রার্থনায় কি কর্ণপাত করবে? আশ্চর্য লোক সুলতান! দেখছে যে একটার পর একটা দুর্গ তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তবু শিবাজীকে ভয় করছে না, শিবাজীর চিঠিকে ভয় করা তো দূরের কথা।

একটার পর একটা যুদ্ধে পরাজিত হয়েও এখনো আদিল শা বিজাপুরকে চিরকাল শাসন করার স্বপ্ন দেখে। হয়তো আওরঙ্গ-জেবের উত্তরোত্তর শক্তি-বৃদ্ধি আদিল শার মনে উৎসাহ সৃষ্টি করছে। আওরঙ্গজেবের শক্তি কি সত্য সত্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে? সুজার মৃত্যু

সংবাদ কি মিথ্যে নয়? এও তো হতে পারে সুজা গোপনে শক্তি সঞ্চয় করে পুনরাক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছে?

হিন্দুর মন্দির ভেঙে দেবার আদেশ কি শক্তিমত্তার পরিচয়? রাজ্য শাসন করতে গিয়ে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ কি শুভ সূচনা? ৭০

প্রজাদের এক বৃহৎ অংশ কি বিক্ষোভের আগুনে বুক জ্বালিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণবে না?

কোন দিক দিয়ে নিজেকে অজেয় শক্তিমান ভাবছে শাহানশাহ আওরঙ্গজেব? এই বিভেদ নীতি কি আসমুদ্রহিমাচল সাম্রাজ্য বিস্তার করতে আদৌ শক্তি জোগাবে কোন বাদশাহ কিম্বা সম্রাটকে?

শিবাজী কি সত্য সত্যই চিঠি পাঠিয়েছে আদিল শার দরবারে? বিশ্বাস করতে হবে এতই নারীদরদী শিবাজী?

মরিয়ম নিজে শিবাজী সম্বন্ধে বড় বেশি দুর্বল। বীরাবাঈ বুঝতে পারে না মরিয়ম কেন শিবাজীর ঘোষণাকে এত সহজ সরল ভাবে গ্রহণ করেছে। শিবাজী যদি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাই করে, সেখানে মরিয়মের স্থান কোথায়? কী পাবে মরিয়ম? ও তো শিবাজীর স্বধর্মী নয়। বিধর্মীকে স্বাধিকার দেবে কি শিবাজী? যবনী বলে ধিকৃত হবার আশঙ্কা নেই?

বিস্ময়কর মরিয়মের বিশ্বাস।

ও বলে: হিন্দু, মুসলমান দুটো শত্রু শিবির নয়। বরং ভ্রাতৃ-প্রতিম প্রতিবেশী। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে পরস্পর নির্ভরশীল। ধর্মের প্রয়োজনে মানুষ নয়, মানুষের প্রয়োজনে ধর্ম।

কিন্তু আজকের রাজা বাদশারা বিপরীতটাকেই মেনে নিয়েছে। ওরা ধর্মের জন্য বলি দিচ্ছে নিরীহ মনুষ্যত্বকে। রাজা বাদশাদের ধর্মের ভেদাভেদে কখনো হিন্দুরা কখনো মুসলমানরা ভোগ করে স্বাধীনতা। যখন হিন্দু-শাসন তখন মুসলমানরা মারা যায় কথায় কথায়—আর যখন মুসলমানী শাসন তখন হিন্দুদেরকে কথায় কথায় কোতল করা হয়। অথচ চাষী, জেলে, কাঠুরে, সূত্রধার প্রভৃতি দরিদ্র প্রজাদের

জীবনযাত্রা ধর্মের ভেদ মেনে চলে না। পরস্পরকে বাদ দিলে শুধু দৈনন্দিন জীবন কেন, উৎসব ধর্মানুষ্ঠান পর্যন্ত অচল হয়ে পড়বে। মরিয়ম আরও বলে ঃ শিবাজীর আদর্শ হচ্ছে—দেশ যদি ঐশ্বর্যশালী হয় সবাই সমানভাবে ভোগ করবে সে ঐশ্বর্য। দেশ যদি দরিদ্র হয় আজকের বিত্তবান মানুষও সে দারিদ্র্যকে স্বীকার করে নেবে।

আদিল শার রাজ্যে বাঈজীর ছদ্মবেশে এ মেয়ে শিবাজীর চর নয় তো।

একদিন বীরাবাঈ কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসেছিল ঃ তুমি শিবাজীর উদ্দেশ্য কি করে জেনেছ বাঈজী সাহেবা ?

জেনেছি শিবাজীর পিতা শাহজীর কাছ থেকে।

বীরাবাঈ তখন বিজাপুরে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে আসে নি। চন্দ্ররাও তখনও জীবিত। জাবেলী দুর্গ তখন পর্যন্ত একটি দুর্ভেদ্য শিবির।

শিবাজী সবে বিদ্রোহের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। মাত্র গুটি কয় দুর্গ কেড়ে নিয়েছে মোগল সম্রাটের তাঁবেদারদের হাত থেকে।

সে সময় সুলতান আদিল বন্দী করেছিল তারই একজন কর্মচারীকে। সে কর্মচারীর নাম শাহজী। প্রৌঢ় শাহজী বন্দী অবস্থাতেই শুনেছিলেন শিবাজীর কৃতিত্বের কথা। ওর সহচরদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার অনুমতি চেয়েছিলেন আদিলশার বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করেও।

পরে রণদুল্লার অনুরোধে সুলতান শাহজীকে শিবাজীর সহচর রণরাও-এর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিয়েছিল। সর্ত ছিল একটি। পুত্রের উদ্দেশ্য জানার ছলে শাহজী যেন কাপুরুষের মত আত্মগোপন না করে।

শাহজী সেদিন হেসে বলেছিল ঃ বিজাপুরের বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী কোনদিন ছলনা করবে না সুলতান।

বিজাপুরের সুলতানও তাই প্রত্যাশা করে তার কর্মচারীর কাছ থেকে।

সে প্রত্যাশার যথাযথ মর্যাদা দিয়েছিলেন শাহজী। রণরাওএর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওদের মাওলা বাহিনী গঠন এবং বিদ্রোহের কারণ জেনে এসেছিল।

আবার কারাগারে পাঠানো হয়েছিল ওকে। এবং এক অভিনব প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছিল আদিলশার চর।

পুত্রকে যদি বিদ্রোহ থেকে নিরস্ত করতে পারেন তাহলে শাহজী আপনাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে।

আমার মুক্তির বিনিময়ে আমার ছেলের বশ্যতা স্বীকার আমি করতে পারব না।

শাহজী উত্তর দিয়েছিল।

আপনার পুত্রের রাজদ্রোহিতায় আপনারও তাহলে সমর্থন আছে শাহজী।

নিশ্চয় আছে। শিবাজী একটা পতিত জাতিকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে, অমানুষিকতা আর অনাচারের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে চাইছে। ঐ মহৎ প্রচেষ্টার পেছনে আমার সমর্থন নিশ্চয় থাকবে।

তা'হলে এই বিদ্রোহে আপনি উৎসাহ জুগিয়েছেন?

না।

নিষেধ করেছেন?

না।

কেন করেন নি?

শিবাজী নিজের চেষ্টায় কৃতি পুরুষের ভূমিকা নিয়েছে। মারাঠা জাতির দরদী নেতা হয়ে উঠেছে। বিগত দশ বছরের মধ্যে তাকে আমি কোন সাহায্যই করি নি। কাজেই আজ নিরস্তই বা করি কী করে?

এর মানে কি এই নয় যে শিবাজী যা করছে তার পেছনে আপনারও সহানুভূতি রয়েছে।

সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু সহযোগিতা নেই কারণ আমি বিজাপুরের রাজকর্মচারী।

তাহলে বিজাপুর সুলতানের আদেশ অমান্য করছেন কেন শাহজী।

সুলতানের আদেশে প্রয়োজন হলে শিবাজীর হাত থেকে হৃতদুর্গ পুনরুদ্ধার করতে যাব। যুদ্ধ করব বিজাপুরের হয়ে। মৃত্যু বরণ করব। তবু শিবাজীকে তার আদর্শচ্যুত হতে বলতে পারব না।

শাহজী !

বলুন—

আদিল শা আপনাকে মুক্তি দিচ্ছেন না। এই কারাগারেই আপনাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। এখনও সময় আছে নতুন করে ভেবে দেখুন।

ভেবে-চিন্তেই আমি বলেছি খাঁ সাহেব। আমি বিজাপুরের ভৃত্য বলে পুত্রকেও তার দাসত্ব মেনে নেবার জন্য ওকালতি করতে পারব না ।

নিজে মেনে নিতে পারলেন, আর পুত্রের বেলায় দোষ দেখছেন কেন ?

আর একটা অন্যায় আমি বাড়াতে চাই না।

আপনার এ সব কথা আদিল শার কানে গেলে কি হবে বলতে পারেন ?

পারি খাঁ সাহেব, সবে তো কারাবাস—তখন হবে ফাঁসী। তাতে কি ! আমি ক্ষত্রিয়। রাজপুত রক্ত আছে আমার ধমনীতে। মরতে ভয় পায় না রাজপুত।

শাহজী, এতদিন এক সঙ্গে বিজাপুরের সেবা করেছি, সেজন্যে বলছিলাম....

রণতুল্লা খাঁর কথা শেষ হবার আগেই শাহজী বলেছেন, সেবা করেছি বিজাপুর সুলতানের আর অমাত্য বর্গের। আমরা যদি বিজাপুরের সেবা করতাম তাহলে বিজাপুরের মানুষগুলো কঙ্কালসার হত না।

এমন তর্ক, এমন ধরনের কথা পরপর কয়েকদিন চলেছিল

শাহজীর সঙ্গে রণতুল্লার। মরিয়মের ঘর থেকে খানিকটা দূরের একটা কক্ষে শাহজীকে নিয়ে আসা হত। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত তাঁকে জেরা, ভীতি প্রদর্শন। মরিয়ম উৎকর্ণ হয়ে শুনত। শুনে মন চলে যেত দূরে, অনেক দূরে···শিবাজীর বিজিত এলাকায়।

সেখানে যেন এক নতুন দেশ তৈরী হয়েছে, নতুন রাজত্ব। মানুষ পেয়েছে মানুষের অধিকার। সে আদর্শের বাণী ঘরে ঘরে পোঁছে দেবার চেষ্টা করছে মরিয়ম। চেষ্টা করছে সে মন্ত্র কানে কানে তুলে দেবার।

লুৎফা এসে ঢুকল মরিয়মের ঘরে। মরিয়ম মুখের দিকে চোখ না তুলে বলে দিতে পারে কে এসেছে।

লুৎফার পায়ে রয়েছে বাঁদী-ছাপ।

কার কথা ভাবছো বাঈজী সাহেবা?

তোর কথা।

পরিহাস তরল গলায় জবাব দিল মরিয়ম।

আমি কি তোমার প্রেমিক?

হতে আপত্তি আছে?

আছে বই কি!

কেন?

আমার মনের প্রেম-যমুনা যে অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে বাঈজী সাহেবা।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত শোনালো লুৎফার কথা।

চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মরিয়ম। লুৎফার চোখে মুখে কি যেন খুঁজে বেড়াল।

এমনিতে লুৎফা হাসিখুশী। কিন্তু মাঝে মাঝে আকস্মিক সে গম্ভীর হয়ে পড়ে—তখন ওর অতীত জানতে ইচ্ছে করে মরিয়মের।

লুৎফা নিজে কখনো তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তোলে না। ও অনুদ্ঘাটিত রেখে দিতে চায় পেছনে ফেলে আসা দিনগুলির ইতিহাস।

মরিয়মের অদম্য কৌতূহল। জানতে চায় বেদনার কারণ। লুৎফার কাছে ব্যর্থ হয়ে মরিয়ম কথা তোলে এক বাঁদীর কাছে। সাকিনা লুৎফার ঘনিষ্ঠতম সহচরী। সাকিনা বাঁদী বলেছিল।

একদিন জল আনতে গিয়ে কৃষক বধূর দল থমকে দাঁড়াল আল পথে। ঘোড়ায় চেপে ছুটে আসছিল বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরা একজন সৈন্য। তার পেছনে অনতিদূরে আরও কয়েকজন সেনানী। চার পাঁচ জন হবে। সামনের বলিষ্ঠকায় অশ্বারোহী হঠাৎ নামল ঘোড়া থেকে। অনুসরণকারী সেনানীর ঘোড়াগুলির গতি হল মন্থরতর।

গ্রাম্য বধূর দলটি বটগাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। নিজেদের আড়াল করতে চাইল গাছের গুঁড়িতে।

কয়েক মিনিট কেটে গিয়েছিল অথচ কেউ নড়ে নি। কৃষক বধূদের বুক ধুক-ধুক করে উঠেছিল। এরা কারা ? ডাকাত নয় তো ?

শক্ত সবল ঘোড়ার সওয়ারীকে দেখে সর্দার মনে হল। ওর ইঙ্গিতে পেছনের লোকগুলো যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওদের উপর।

কিন্তু কি আশ্চর্য ! যেমন অকারণে ঘোড়া থামিয়েছিল তেমনি অকারণে ঘোড়া ছুটিয়েছিল ওরা।

কৃষক বধূর দল জলে নেমেছিল। চৈত্রের মজা নদী। কোমর জলে চান করছিল। জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল একে অপরকে।

এমন সময় ও মা, নদীতীরে ওই লোকটি কে !

কোমর জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে গোপন করতে চেয়েছিল দেহের যৌবনোল্লাস।

কিন্তু জলের মধ্যে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে কতক্ষণ পারে ? ওদিকে ঘর সংসার—এদিকে বেলা যায় যায়।

শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যে একজন বলেছিল লজ্জা সরমের মাথা

খেয়ে : আপনি একটু সরে দাঁড়ালে আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারি। দয়া করে সে সুযোগ দিন আমাদের।

লোকটার মুখের উপর একটা মৃদু হাসির তরঙ্গ নেচে উঠেছিল। চোখের তারায় যেন একটা লোভের স্ফুলিঙ্গ।

আমার কাছে সরম কেন রূপসী? আমি অযোধ্যার সুবেদার।

সুবেদার বলে কি মেয়েদের লজ্জা সরমের মূল্য দেবেন না? যান এখান থেকে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল ওদেরই একজন।

তোমাদের মধ্যে কাউকে আমার বেগম করা যায় কিনা দেখছি। বলে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল অশ্বারোহী। নদীর বালুকা বিস্তার পেছনে রেখে তীরে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল সোজা উত্তর দিকে।

হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল কৃষক বধূর দল। আস্তে আস্তে উঠে এসেছিল নদী-তীরে। দিগন্তরেখায় লীন হয়ে গিয়েছিল ঘোড়সওয়ার।

ছোট্ট জীবনে ছোট্ট একটি তুচ্ছ ঘটনা কেউ মনে রাখে নি। পথে ঘাটে চলতে ফিরতে এমন কত চোখ অনুসরণ করে মেয়েদের রূপ যৌবনকে।

কিন্তু সেই অনুসরণের পথ বেয়ে যে এত বড় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে, কেউ ভাবে নি সে দিন। মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে বাড়ির আঙিনা থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এক কৃষক বধূকে। চীৎকার শুনে বাধা দিতে এসেছিল পাড়া প্রতিবেশী, ধারালো সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। কিন্তু সাক্ষাৎ সুবেদার পিঙ্গল বর্মণকে দেখে কেউ এক চুল এগোতে সাহস পায়নি সে দিন।

এখানে থেমে সাকিনা বাঁদী নিঃশ্বাস নিয়েছিল।

মরিয়ম ছটফট করে উঠে প্রশ্ন করেছিল : তারপর?

তারপর এক এক করে তিনটি বছর কেটে গেল। এক দিনের জন্যেও সূর্যের আলো লুৎফাকে দেখানো হয় নি পিঙ্গল বর্মণের প্রাসাদে।

ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে মরিয়ম বলেছিল, জানি। অসূর্যম্পশ্যার যৌবন নাকি রাজা বাদশাদের কাছে সব চেয়ে উপাদেয়।

সাকিনা বাঁদী কম্পিত কণ্ঠে বলেছিল, সেই তিনটি বছরের প্রতিটি পল অনুপল লুৎফা কেবল মৃত্যু কামনাই করেছে। এক দিন লুৎফাকে পাতালকুঞ্জ থেকে বাইরে বের করে দিল সুবেদার পিঙ্গল বর্মণ।

লুৎফা মরতে চেয়েছিল নদীতে ঝাঁপ দিয়ে। নদীর জলের ধারে গিয়েও ফিরে এসেছে। মনে হয়েছে চূণীরূপা গ্রামের সেই জোয়ান মরদ কি আজও ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আজও লুৎফার প্রত্যাবর্তনের আশায় দিন গুণছে?

পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিল লুৎফা গ্রামের পর গ্রাম। ফিরে গিয়েছিল চূণীরূপায়। সেই নদীর ধারে, যেখানে স্নান করতে গিয়ে দেখেছিল সর্বনাশের মুখবন্ধ।

মনের মধ্যে অজস্র ভাবনা। ওকে গ্রহণ করবে তো শওকত আলি? সাদি করা বিবির আদরে ওর সর্বাঙ্গ থেকে পশুর থাবার দাগ মুছে ফেলবে তো?

চূণীরূপার যমুনায় জল খেয়ে উঠে আসবার সময় জলের মধ্যে নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠেছিল। একি চেহারা হয়েছে ওর! এই স্বাস্থ্য নিয়েই কি এই নদীর জলে সাঁতার কাটত লুৎফা! খেলা করত প্রতিবেশী মেয়ে বৌদের সঙ্গে?

খবর পৌঁছেছিল বাড়ীতে। লুৎফা ফিরে এসেছে। কিন্তু কেউ ওকে আবাহন জানাতে এগিয়ে আসেনি। কেউ বলল না কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে, আহা! প্রাণে মারে নি যে এই ভালো।

বরং জরুরী মজলিশে মৌলভির দল বলেছিল: দূর করে দাও ওকে।

তবু অপেক্ষা করেছিল [illegible]ম। কিন্তু যার আশায় এতদূর আসা

যার জন্য বেঁচে থাকা সে একবার দেখাই দিল না। শুনল—ও আবার সাদি করেছে। আবার নতুন বিবি এনেছে ঘরে।

লুৎফা আবার হাঁটতে শুরু করেছিল। যে পথ পেছনে ফেলে এসেছিল আবার সে পথ ধরে ফিরে গিয়েছিল নদীর ধারে।

কিন্তু তার আগেই খোদার মেহেরবানীর মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা লুঙ্গি পরা লোক।

বলেছিল ঃ তোমাকে আমি সাদি করব লুৎফা।

একজন তোমাকে মদত করল না বলে কি তুনিয়াতে আর কেউ তোমাকে মদত করবে না? আমার ঘরে চল। কল্‌মা পরিয়ে সাদি করব। কেন তুমি মরবে। কেন তুমি আত্মহত্যা করবে।

লুৎফা ওর কথায় ভুলেছিল। হয়তো বেঁচে থাকার সীমাহীন আকুতি থেকে বিশ্বাস করেছিল লোকটাকে।

কলমা পরিয়ে সাদি করল লোকটা লুৎফাকে। তারপর দিন কুড়ি বিবির আদরে সোহাগে ওকে ভরিয়ে দিল লোকটা। হঠাৎ একদিন আত্মীয়ের বাড়ি নিয়ে যাবে বলে ওকে বেচে দিল ব্যবসায়ীর গদীতে। সে ব্যবসায়ী লুৎফার পায়ে বাঁদীছাপ এঁকে দিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে বেচে দিল এক শেঠজীর কাছে। শেঠজীর হাত থেকে ওকে কিনে নিয়েছে আদিল শা।

সাকিনা বাঁদী যখন শেষ করল কাহিনী তখন তার গাল বেয়ে জল ঝরছিল। মরিয়মের চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন।

হারেমের বাঁদী-বাঈজীদের অতীত সবারই প্রায় এক রকম। তবু অপরের অতীত জানতে প্রত্যেকের কৌতূহলের অন্ত নেই। অন্যের অতীত সবাই জানতে চায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এক বেদনার্ত প্রাণ অন্য এক বেদনার্ত প্রাণের গভীরে আলো ফেলতে কী যে ব্যগ্র তা মরিয়মের চেয়ে বেশী কে জানে!

লুৎফা বোস! মরিয়ম বলল, অমন অস্থির হচ্ছিস কেন।

লুৎফা একবার মরিয়মের তোরঙ্গ ঘাঁটছে, একবার নাচতে নাচতে

যাচ্ছে গবাক্ষের প্রান্তে, একবার কষ্টিপাথরের বারান্দার দোলনায় দোল খাচ্ছে।

ভাল লাগছে না....সব কিছুই যেন আমার নয় বলে মনে হচ্ছে। এত বড় দুর্গ, এত বড় প্রাসাদ…এত দামী দামী জিনিস আর সোনা-রূপার ছড়াছড়ি…কিন্তু কিছুই তোমারও নয়, আমারও নয়।

কী হল তোর…কী বকছিস? বাঁদী বাঈজীদের নিজের বলতে কিছু থাকে না, থাকতে নেই। এই দুনিয়াতে আমরা যে এসেছি কেবলই দিতে, নিতে নয় কিছু।

লুৎফা মরিয়মকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে বলল, তুমি দাও · যত পার দাও। আমি আর দিতে পারব না।…তোমার আর কী। যা খুশী করতে পার, যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। তোমার তবু দুর্গের মধ্যে যেখানে ইচ্ছে বেড়ানোর অধিকার আছে। আমাদের নেই। কাঁহাতক আর মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত সহ্য হয়? যাই, আতরপানি মাথায় না ঢাললে মাথা ঠাণ্ডা হবে না।

ছুটে পালাল লুৎফা। বুলবুলের মত যেন ছোট্ট পাখিটি!

বাঁদীরা তাদের কুঠুরীর এলাকা থেকে কোথাও যেতে পারে না। সুলতান বা ফৌজদারের অনুমতি কোথাও যাবার একমাত্র ছাড়পত্র।

ময়িয়ম বাঈজীর অধিকার আছে সর্বত্র পরিভ্রমণ করার। সেই সুযোগে বুদ্ধ পূর্ণিমার রাতে মরিয়ম আর একবার গেল কৃষ্ণাজীব কুঠীতে।

কৃষ্ণাজী কুঠীতেই ছিলেন। সুলতালের কাছে পেশ করবার জন্য কী লিখছিলেন।

বোরখা খুলে মরিয়ম দাঁড়াল কুঠীর ভিতর। কপাট ভেজিয়ে দিয়েছিল আগেই। মরিয়মের রূপের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে

থাকলেন কৃষ্ণাজী। সে দিন দূতকর্মের ব্যস্ততায় ভালো করে দেখেন নি মরিয়ম কে। আজ ভালো করে দেখলেন। এমন রূপসী রমণীর বুকে সকল মানুষের জন্য ভালবাসার অমৃত আধার কী করে থাকতে পারে ভেবে কূল পেলেন না কৃষ্ণাজী।

বললেন···

আবার কেন এসেছ মা? সেদিন তো তোমার পরামর্শ মতোই কাজ করে এসেছি। শুনেছ নিশ্চয়।

শুনেছি কৃষ্ণাজী। আপনি ঘটনাস্থল থেকে ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা শুনিয়েছেন সুলতানকে। ঠিক সেই ভাবেই আমারা শুনেছি।

কথা বলবার অবকাশে কৃষ্ণাজীর মন একবার সেদিনের ঘটনাস্থলে চলে গেল।

দুর্যোগময় রাত্রি। একটিও তারা ছিল না আকাশে। মেঘে মেঘে সংঘর্ষ ঘটছিল। বিকট আওয়াজ হচ্ছিল। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল।

শিবাজীর দুর্গ থেকে কতকটা তফাতে দেখা করার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। সর্ত ছিল এক জনের বেশি রক্ষী সঙ্গে নিতে পারবে না কেউ। শিবাজী তাই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আসতে একটু দেরী করেছিল। আফজল খাঁ সে সর্ত মানে নি। সঙ্গে তিন চারজন বেশি লোক ছিল। শিবাজী এসেই ওদেরকে সরে যেতে বলেছিল। আফজল রাজি হয়েছিল। কারণ সে তৈরী হয়েই ছিল। ওর পোষাকের নীচে ছিল তলোয়ার। এবং এও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যে প্রথম সাক্ষাতের আলিঙ্গনেই গলা টিপে মারবে শিবাজীকে।

কিন্তু কৃষ্ণাজী সে খবর আগেই শিবাজীকে সরবরাহ করেছিল সন্ধির প্রস্তাব রাখতে গিয়ে।

শিবাজী প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। আলিঙ্গনের মুহূর্তে যখন শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে চেয়েছিল আফজল, তখনই শিবাজী ওর বিচ্ছুয়া আর বাঘনখ ব্যবহার করেছিল।

সেখানেই জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়েছিল আফজল খাঁর।

ওর একজন দেহরক্ষীও বাধা দিতে এসে প্রাণ হারিয়েছিল।

পালিয়ে এসেছিল কৃষ্ণাজী, সঙ্গে অন্য একজন দেহরক্ষী।

খবর পেয়ে আফজল খাঁর সৈন্য বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শিবাজীর দুর্গ লক্ষ্য করে।

কিন্তু আফজল খাঁ হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে নি ওর বাহিনী। তানাজীর সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিল। প্রতাপগড় হাত-ছাড়া হয়েছিল।

সে খবর বিজাপুরে পৌঁছে দিয়েছিল কৃষ্ণাজী সুলতান সকাশে। তারপর থেকে কয়েক দিন মনমরা হয়ে ছিল। কাজটা ভালো হল কি খারাপ হল খুঁজে বেড়িয়েছিল নিজের মধ্যে।

বিজাপুর সুলতানেরই মাইনে করা লোক কৃষ্ণাজী। বিজাপুরের স্বার্থেই তার কাজ করা উচিত।

কিন্তু সে কিনা সুলতানের বিশ্বস্ত সেনাপতিকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য সহযোগিতা করল বিজাপুরের প্রধান শত্রু শিবাজীর সঙ্গে?

মরিয়মের কথাগুলো মনে পড়ল।—ন্যায়ের জন্য সত্যের জন্য একাজ আপনাকে করতে হবে কৃষ্ণাজী। আফজল খাঁর মত একজন সেনাপতি কিংবা আদিল শার মত একজন সুলতানের চেয়ে দেশ অনেক বড়।

গবাক্ষ থেকে সরে এসে মরিয়ম বলল: শিবাজীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে আপনি কি অনুতপ্ত?

না মা, আমি একটুও অনুতপ্ত নই। বরং গর্বিত।

মরিয়ম মৃদু হাসল। আপনার কাজের জন্য কোন নজরানা দিতে পারলাম না কৃষ্ণাজী।

নজরানা আমার দরকার নেই। আর তুমি দেবেই বা কোথা থেকে?

জানেন তো, বিজাপুর সুলতানের জলসাঘরের বাঈজী আমি

খাদ্য পানীয় আর স্ফূর্তির জন্য সব উপকরণ পাই, পাই না স্বতন্ত্র কোন অর্থ।

জানি মা। তাছাড়া কি দরকার নজরানার। আমি যা করেছি তা তো তোমার জন্য করি নি। করেছি—দাক্ষিণাত্যের মানুষগুলোর জন্য।

আপনার এ বোধের জন্য আপনাকে কুর্নিশ জানাচ্ছি কৃষ্ণাজী।

আমার চোখের সামনে এ আলো তুমিই তো জ্বালিয়েছ মা।

আলোটা ঠিকই জ্বলছিল, আমি শুধু সে আলোর প্রতি আপনার দৃষ্টিটাকে নিবদ্ধ করিয়েছি কৃষ্ণাজী।

তার জন্যেও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছ মা।

আওরঙ্গজেবের ফরমান কি এখানে পৌঁছে গেছে।

আওরঙ্গজেবের ফরমানের তো অন্ত নেই। কোন ফরমানের খোঁজ নিচ্ছ মা।

ঐ যে নাচগানকে নির্বাসন দেওয়ার ফরমান?

পৌঁছে গেছে। তবে আদিল শা সে ফরমান মানবেন বলে মনে হয় না। সেদিন রণতুল্লার সঙ্গে ঐ কথাই বলছিলেন। বলছিলেন রাজ্যব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহের ঝুঁকি নিয়ে দিন কাটাই। প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে একটু নাচগানের মজলিশ থাকবে না এ কেমন কথা! দরকার হলে আওরঙ্গজেবের চরকে ঘুষ দেব—তবু নাচগান বন্ধ করব না।

মরিয়ম যেন উল্লসিত হয়ে উঠল। বলল: এ কথা আপনি নিজে শুনেছেন কৃষ্ণাজী? এ খবর কি সত্য?

সত্যি মা। সেদিন আওরঙ্গজেবের কর্মচারী এসে ফরমান হাতে দিয়ে চলে যাওয়ার পর যে দরবার হয় সেখানে আমি হাজির ছিলাম মা।

বাঁচালেন কৃষ্ণাজী। আপনি আমাকে প্রাণে বাঁচালেন।

সেদিন অদ্ভুত ফরমান শুনে তোমার কথাটাই মনে পড়ছিল মা। তোমার বিষণ্ণ মুখখানাই চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। তারপর

সুলতানের ফন্দী জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি ও খবর কোথা থেকে শুনলে মা?

দুটো ঠোঁট ঈষৎ প্রসারিত করে খুব মোলায়েম করে হাসল মরিয়ম: আমিই তো সব খবর আগে পাই কৃষ্ণাজী। আমার আসরেই তো সুলতান প্রলাপ বকেন। সঙ্গীত নির্বাসনের দুঃসংবাদটা লুৎফাই আগে আমাকে দিয়েছিল। হ্যাঁ লুৎফা। বেগমের খাসমহলের প্রথম নম্বর বাঁদী লুৎফা। বেগমের কাছে সেটা আনন্দের খবর কিনা। নাচের জলসা বন্ধ হয়ে গেলে সুলতান বেগমের কাছেই বরাবর থাকবেন যে।

কৃষ্ণাজী বললেন: তোমার কোন ভয় নেই মা। তোমাকে মর্যাদা দিতেই হবে। মোগল রাজত্ব না দিক, শিবাজীর নতুন রাষ্ট্র নিশ্চয় দেবে। শোন বলছি, কোন বানানো গল্প নয় মা। সত্য ঘটনা। আহম্মদ মুখোমুখি হয়েছিল শিবাজীর সৈন্য বাহিনীর। রাহুল ছিল সে বাহিনীর নায়ক।

পর্বতের গুহায় চূড়ায়…চড়াই উৎরাইএ দুজনের তুমুল যুদ্ধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরাজিত মুলানা আহম্মকে বন্দী করা হয়। সঙ্গে তাঁর এক কন্যাকেও ধরে আনা হয়।

রাহুলের আর খুশীর অন্ত ছিল না। মুলানা আহম্মদের সামনেই বলেছে: এবার আমি বড় হতে পারি। সামান্য সিপাহী থেকে জাগীরদার হতে পারি।

মুলানা আহম্মদ বলেছে: আমি পরাজিত আমি বন্দী। যে কোন শাস্তি দাও মাথা পেতে নেব। কিন্তু আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও।

রাহুল শুনে অট্টহাস্য করে উঠেছে। বলেছে: ওকে ছেড়ে দিলে বড় হব কি করে?

ওকে ছেড়ে দিলে তোমার মহত্ব প্রমাণিত হবে শিবাজী-সহচর।

না, ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। ওকে আমি উপঢৌকন

দেব শিবাজী মহারাজকে। কল্যাণের শাসন কর্তার পদ আমার কে কেড়ে নেয় ?

মুলানা আহম্মদ তবু কাকুতি মিনতি করেছে মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

কোন কথাই শোনে নি রাহুল ! সে ওদের টেনে নিয়ে গেছে।

কে যেন খবর পৌছে দিয়েছিল শিবাজীর কানে। শিবাজী সব জরুরী কাজ-কর্ম ফেলে ছুটে এসেছিলেন রাহুলের কাছে।

কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। নারীর মর্যাদাহানির জন্য রাহুলকে অকথ্য ভাষায় ভৎ‍র্সনা করেছিলেন।

সত্যি বলছেন কৃষ্ণাজী ?

মরিয়ম যেন উল্লসিত হয়ে উঠল।

হ্যাঁ মা, শিবাজী শুধু ভৎ‍র্সনা করে ক্ষান্ত হন নি। রাহুলকে সৈন্যবাহিনী থেকে বরখাস্ত করেছেন। আহম্মদ খাঁর কন্যা সাকিলাকে ছেড়ে দিয়েছেন শিবাজী। পাঁচ জন বিশ্বস্ত সৈন্য বিজাপুর সীমান্ত পার করে দিয়ে গেছে সাকিলাকে।

সে এখন কোথায় আছে কৃষ্ণাজী ? তার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন আমাকে ?

তাকে কোথায় রাখা হয়েছে আমাদের কাউকে জানতে দেয় নি সুলতান। কাল সকালেই সে এসেছিল আদিল শার দরবারে। নিজের মুখেই তো বলল এ সব ঘটনা।

কিন্তু সুলতান কি বললেন জান মা ! বললেন ঃ এ সব কথা অন্য কোন কানে যেন না ওঠে। এতে শত্রুপক্ষের মহত্বের প্রচার হবে। বিজাপুর রাজ্যের ভীষণ ক্ষতি করবে এ কাহিনী। বরং প্রচার করে দাও যে শিবাজীর সৈন্যদের হাতে অকথ্য অত্যাচার ভোগ করেছ। বল যে নিজের বুদ্ধি এবং সাহসিকতার জন্যে পালিয়ে এসে প্রাণে বেঁচে গেছ।

কি বলতে যাচ্ছিল মরিয়ম এমন সময় মনে হল দরজার বাইরে

কে যেন আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছে। গলা বাড়িয়ে বোরখার রহস্যময়ীকে যেন চিনবার চেষ্টা করছে।

কে, কে ?

ছুটে দরজার দিকে এলেন কৃষ্ণাজী। কিন্তু তার আগেই দ্রুত পায়ে গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই ছায়ামূর্তি।

কৃষ্ণাজী ভয় পেলেন। মুখে চোখে ত্রাসের ছায়া ভাসল।

মা!

ইঙ্গিত শুভ নয় মা, তুমি চলে যাও।

কে বলে মনে হল কৃষ্ণাজী।

চিনতে পারলাম না। তবে যতদূর মনে হল রণদুল্লা। তুমি আজ চলে যাও মা।

দ্রুত হাতে বোরখা পরল মরিয়ম। দু'হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে কুর্ণিশ করল কৃষ্ণাজীকে। তারপর ছায়া ছায়া অন্ধকারের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল মরিয়ম।

দাক্ষিণাত্যে একটার পর একটা দুর্গ হাতছাড়া হওয়ার খবর শুনে ভাবিত হয়ে পড়ল আওরঙ্গজেব। নতুন সেনাপতি পাঠাবার কথা চিন্তা করল সে। শুধু নতুন নয়, দক্ষও। শেষ পর্যন্ত শায়েস্তা খাঁকে পাঠাল একদল সুশিক্ষিত সৈন্য সঙ্গে দিয়ে। শায়েস্তা খাঁ আশ্বাস দিয়ে এল। আওরঙ্গজেবের দুশ্চিন্তা ম্লান মুখে আশার আলো ফুটিয়ে তারপর পুনার দিকে অগ্রসর হল।

পুনরায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল শিবাজীর বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার দিনটির জন্যে।

কারণ যে সৈন্য বাহিনী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তারা সম্মুখ সমরে খুবই পারদর্শী।

কিন্তু শিবাজী ধূর্ত। সম্মুখ সমরে তার পরাজয় যে অবধারিত এ সত্য সে জানে বলেই নিজের সীমানার মধ্যে তাঁবু ফেলে নিশ্চিন্ত থাকল। শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল।

এদিকে শায়েস্তা খাঁর আত্ম-বিশ্বাস বেড়ে গেল। সে ধরে নিল যে শিবাজী ভয় পেয়েছে। নিজের উপরে আস্থা হারিয়েছে। সামান্য মাওলা সৈন্য নিয়ে একপাও এগোবে না এ দিকে। শায়েস্তা খাঁ ঠিক করল যে নিজে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করবে না। শিবাজী ভয়ে ওর এলাকাতেই থাকুক। যদি আক্রমণ করে তখন দেখা যাবে!

ইতিমধ্যে জীবনটাকে একটু ভোগ করে নেওয়া যাক। উত্তর ভারতে থাকতে ভোগ বিলাসের দিকে মন দিতে পারে নি। সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে শাসনে আর যুদ্ধে।

আজ ঐ হিন্দু নরপতিকে ঠাণ্ডা কর—কাল অমুক ভূম্যধিকারীর বিদ্রোহ দমন কর—পরশু ঐ জায়গীরদারের দম্ভ চূর্ণ করে এস—আদেশের পর আদেশ এসেছে দিল্লীর মসনদ থেকে। আর একটার পর একটা নির্বিচারে মেনে নিয়ে আওরঙ্গজেবকে সন্তুষ্ট করেছে শায়েস্তা খাঁ। জীবনে আনন্দের স্থান কোথায় ভাবতে পারে নি।

পুনায় এসে দেখল প্রচুর অবকাশ। লালসাতৃপ্তির জন্য সরঞ্জামেরও অভাব নেই। নারী সুরা, বাঈজীরাও যেন ওর আগমনের প্রতীক্ষা করছিল।

তার পর প্রজারাও যুদ্ধ-ভয়ে সন্ত্রস্ত, আক্রমণ আর প্রতি আক্রমণে ধৈর্য-হারা। এখন একটু অভয় বাণী শোনালে ওরা খুশী হবে। অর্থ সোনা রূপা দরাজ মেজাজে দান করবে। অর্থের চেয়ে ওদের কাছে শান্তি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে শায়েস্তা খাঁ বড় জবরদস্ত শাসন কর্তা। তার আগমন সংবাদে শিবাজী পর্যন্ত ব্যস্ত। অভিযান বন্ধ হয়ে আছে।

আওরঙ্গজেবেরও কিছু বলার থাকবে না। কারণ ও এখানে আসার পর থেকে নতুন কোন দুর্গ বা এলাকা হাতছাড়া হয় নি।

মাথার মধ্যে শুধু একটি চিন্তা, সুরা আর নারী, নারী আর সুরা। কাজেও তাই করতে লাগল।

সাধারণ সেনানীরাও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। প্রজাদের উপর নিপীড়ন, নারীর শ্লীলতাহানি একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

শায়েস্তা খাঁর কাছে নালিশ জানালেও কোন সুবিচার পাওয়া যায় না। সামান্যতম শাস্তির ব্যবস্থাও নেই জঘন্যতম অপরাধের জন্য।

শায়েস্তা খাঁ ছিল জলসাঘরে মশ্গুল···বাঈজীর ওড়না আকাশে উড়ছিল....কাঁচুলি দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছিল....ঘাঘরা ফেঁপে উঠছিল, হালকা পশমী দেহাবরণ ভেদ করে দৃষ্টিকে আছন্ন করছিল··· কাঁপছিল বাঈজীর যৌবন।

শায়েস্তা খাঁ বসেছিল অদূরে। একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে। সরাবের গ্লাস ছিল হাতে। একটু একটু করে পান করছিল আর তবলচির হাতের বোলের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছিল। বাহবা! বাহবা! মাঝে মাঝে নাচের তারিফ করতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠছিল।

শায়েস্তা খাঁর প্রশংসা বাঈজীর অমূল্য সম্পদ। মনে মনে বোধ হয় উল্লাস বোধ করছিল বাঈজী। নাচের ঘূর্ণি তুলছিল, তুফান সৃষ্টি করছিল।

এমন সময় এক আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কাছে এসে কুর্নিশ করে বলল: সর্বনাশ হয়ে গেছে খাঁ সাহেব, সর্বনাশ।

নেশারক্ত চোখ তুলল শায়েস্তা খাঁ। সে চোখে কোন বিকার বৈলক্ষণ্য নেই। কোন সাড়াও নেই।

কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গেল জলসাঘর। থেমে গেল বাঈজীর নূপুরনিক্কন, সারেঙ্গীর সুর মূর্চ্ছনা হারিয়ে গেল—হারিয়ে গেল তবলার বোল।

সওয়ানি নিগারএর সঙ্গে ছিল শায়েস্তা খাঁর ফৌজদার। সে এগিয়ে এল খাঁ সাহেবের কাছাকাছি। মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল : ভীষণ দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে এই সৈনিক, খাঁ সাহেব !

দুঃসংবাদ শোনার জন্যও প্রমত্ত শায়েস্তা খাঁর কোন আগ্রহ দেখা গেল না।

হাতের ইশারায় বাঈজীকে বলল : চালাও, থামলে কেন দিলজান।

হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গনে ধরতে গেল শায়েস্তা খাঁ বাঈজীকে। বাঈজী ধরা দিল না। বলল : আপনার ফৌজদার কি বলছে শুনুন খাঁ সাহেব।

কি বলছে ?

ওকেই জিজ্ঞেস করুন !

কি বলছ রহিম খাঁ ?

জলসাঘরের মেঝেতে ভর করে উঠে দাঁড়াতে চাইল শায়েস্তা খাঁ। কিন্তু পারল না।

রহিম খাঁ এসে সাহায্য করল। তুলে দিল প্রভুকে। বলল : শত্রুপক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

যুদ্ধ ?

দুটো শব্দ আলাদা করে উচ্চারণ করল শায়েস্তা খাঁ।

যুদ্ধ খাঁ সাহেব ! শিবাজীর বাহিনী ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে আমাদের দুর্গ লক্ষ্য করে।

এগিয়ে আসছে ? কে ? শিবাজী ?

জি, খাঁ সাহেব। মাওলা সৈন্য ছুটে আসছে।

আসুক না। টের পাবে মজা। শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে লড়াই করবে ঐ চুহা ? শমন ওর শিয়রে নিশ্চয়।

সুরার নেশা কাটাবার সরবত তৈরী করে নিয়ে এল বাঈজী।

শায়েস্তা খাঁর মুখের কাছে তুলে ধরে বলল : সরবতটা খেয়ে নিন খাঁ সাহেব। দুর্গ বিপন্ন। আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ান।

বাঈজীর হাত থেকে সরবত নিল শায়েস্তা খাঁ। এক চুমুকে পান করল।

রক্তবর্ণ চোখ খুলে তাকাল সামনে। দেহরক্ষীর কাঁধে ভার রেখে বলল : আমাকে দুর্গদ্বারে নিয়ে চল রহিম খাঁ। আমার সৈন্যরা কি করছে দেখি।

দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়াল শায়েস্তা খাঁ। তাকাল পশ্চিম দিকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে শিবাজীর সৈন্যদের। পাহাড়ের গায়ে যেখানে সবুজ বনানী রাত্রির অন্ধকারকে আরও গাঢ় অন্ধকারে রূপান্তরিত করেছে সেখানে শত সহস্র মশাল জ্বলছে। ছোটাছুটি করছে ইতস্তত।

শায়েস্তা খাঁ সেদিকে তাকিয়ে থাকল কিয়ৎক্ষণ। এক সময় দৃপ্ত কণ্ঠে বলল : আমাদের অশ্বারোহীরা ওদিকে ছুটে যাক। ঐ পাহাড় থেকে নেমে দুর্গ আক্রমণ করার সুযোগ যেন না পায় শিবাজী। জঙ্গলেই যেন অসভ্য সৈন্যরা প্রাণ হারায়।

শায়েস্তা খাঁর হুকুম তামিল করবার জন্য ছুটল ঘোড়ার মিছিল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী এগিয়ে গেল মশাল লক্ষ্য করে।

ঘণ্টাখানেক বাদেই শায়েস্তা খাঁকে অবাক করে দিয়ে পুনার দুর্গ আক্রমণ করল শিবাজীর বাহিনী।

অদৃষ্টের পরিহাস না বুদ্ধিভ্রষ্টতা কে জানে, এ দুর্গ রক্ষা করার মত কোন সুশিক্ষিত বাহিনী এখানে অবশিষ্ট নেই। যারা আছে তারাও অপ্রস্তুত। আমক্রণ প্রতিহত করার চেষ্টা মাত্র করল। সফল হল না। কেউ মারাঠা সৈন্যের হাতে প্রাণ দিল। কেউ বন্দী হল। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল মাওলা সৈন্য।

গোপন পথ ধরে বেরিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে গেল শায়েস্তা খাঁ।

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল বুঝতে পারল না। পুণা থেকে দীর্ঘ বিশ মাইল পথ পেছনে রেখে আর একটি ছোট্ট দুর্গে আশ্রয় নিল শায়েস্তা খাঁ।

আদিল শার জলসাঘরে হাজার বাতি ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠল একে একে।

আদিল শা সিংহাসনে হেলান দিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল সামনের পর্দায়। আর ভাবতে লাগল কি করলে মন পাওয়া যাবে মরিয়মের। এমন সুন্দর চোখ, বুকের এমন নিটোল গড়ন, এ মাটির পৃথিবীতে কি করে সম্ভব বুঝে উঠতে পারে না আদিল শা। এ কি নারী? না হুরী?

মরিয়ম। ওর জলসাঘরের বাঈজী মাত্র। কিন্তু নাচে আশ্চর্য ভালো। ওড়না যখন ওড়ে, কাঁচুলী যখন কম্পন তোলে, ঘাঘরা ফুলে যখন ময়ূর পুচ্ছের রূপ নেয়, তখন আদিল শাহের রক্তের মধ্যে ঝড় তোলে।

ঝড় আজও তুলবে। কিন্তু যে ঝড় আদিল শাহের বুকের পাথারে উথালি পাথালি করছে সে ঝড় কি দমিত হবে মরিয়মের নাচের ঘূর্ণিতে?

ঝড়ই তো! সকালের দিকে খবরটা নিয়ে এসেছে ওরই সৈন্য বিভাগের একজন লোক। যে নিয়ে এসেছে সেও যেন কেঁদে ফেলল খবরটা দিতে গিয়ে। গলার স্বর তার কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। অস্পষ্ট হয়ে আসছিল উচ্চারণ।

এত বড় অঘটন কি করে ঘটে গেল বুঝে উঠতে পারল না আদিল শা। প্রথমটায় যেন বিশ্বাস করতে চায় নি ওর মন। বিশ্বাস করার কথাও নয়।

শায়েস্তা খাঁর মত জাঁদরেল সেনাপতি তার দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে

পরাজিত হবে পর্বত-মুষিক শিবাজীর কাছে, এ যেন চিন্তার অতীত ছিল আদিল শার।

প্রথমটায় বিশ্বাস হয় নি বলেই চুপচাপ ছিল। কিন্তু যতই সময় অতিবাহিত হতে লাগল ততই ঘটনার সত্যতা ওর মনকে নাড়া দিতে থাকল। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরে দাপাদাপি শুরু হল। শুরু হল হৃৎপিণ্ডের উদ্দাম নৃত্য।

কি সাংঘাতিক বুদ্ধি লোকটার। জানে মুখোমুখি লড়াই করলে সুবিধা করতে পারবে না, হেরে যাবে, তাই আশ্রয় নিয়েছে ছলনার।

গুপ্তচর পাঠিয়ে খবর নিয়েছিল শত্রু শিবিরের। খবর নিয়ে জেনেছে, শায়েস্তা খাঁ ভোগ বিলাসে ব্যস্ত। তাই বলে একেবারে যে ঘুমিয়ে ছিল তাও নয়। পুণা রক্ষার জন্য সজাগ ছিল অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য। অজস্র তাঁবুও দুর্গের বাইরে অসংখ্য দর্শকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল।

শিবাজী জানতো ঐ বিরাট বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার মত শক্তি বা সামর্থ্য ওর নেই। তাই শক্তির উপর নির্ভর না করে বুদ্ধির উপর নির্ভর করল। নির্ভর করল অত্যাধুনিক কৌশলের উপর।

শায়েস্তা খাঁর বাহিনীকে বিপথ গামী করতে হবে। পুণার দুর্গ থেকে অন্যত্র ওদের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ যেখানে আক্রমণ করবে তার বিপরীত দিকে যুদ্ধের দামামা বাজাতে হবে।

এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে মোগল সৈন্যরা মনে করে সে দিকে আক্রমণ করেছে শত্রু সৈন্য।

করেছেও তাই শিবাজী। অজস্র গরু মোষ ছাগল ভেড়া সংগ্রহ করেছে এক জায়গায়। আর ওদের শিং-এ বেঁধে দিয়েছে প্রজ্বলিত মশাল। ছেড়ে দিয়েছে শত্রু শিবিরের বিপরীত দিকে পাহাড়ের উপত্যকায়। আগুন দেখলে কে না ভয় পায়? গরু মোষ ভেড়া ছাগলগুলোও পেয়েছে। ঐ প্রজ্বলিত মশাল নিয়ে ছোটাছুটি শুরু

করেছে। দলে দলে ভাগাভাগি হয়ে পাহাড়ের এখানে সেখানে ছুটতে শুরু করেছে।

মোগল সৈন্যের দৃষ্টি ফিরেছে সে দিকে। প্রথমটা হকচকিয়ে গেছে। কিন্তু পর মুহূর্তে বুঝে নিয়েছে শত্রু সৈন্য এগিয়ে আসছে। এক্ষুণি যদি বাধা না দেওয়া যায় তাহলে প্রধান দুর্গ অবরোধ করবে। তখন হয়তো যুদ্ধ জয় করা যাবে না।

তার চেয়ে এগিয়ে যাওয়া ভালো। শায়েস্তা খাঁ নির্দেশ দিল অগ্রসর হতে। যে পাহাড়ের উপত্যকায় শত্রু সৈন্যরা জমায়েৎ হয়েছে সে পাহাড়ের দিকে ধাবিত হতে হবে দ্রুত গতিতে।

মাওলা সৈন্যদের গতিবেগ স্তিমিত করতে হলে ঐ পাহাড়ের গুপ্ত পথগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে প্রতিটি গিরিপথের অভ্যন্তরে।

শায়েস্তা খাঁর হুকুম তামিল করল ওর সুসজ্জিত বাহিনী। এগিয়ে গেল ওরা।

পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে উপত্যকায় গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল সেখানে কোন সৈন্য নেই। একটি মাওলা সৈন্যের সন্ধানও পাওয়া গেল না। মশালগুলোও সব নিভে গেছে। চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার আর নিঃসীম শূন্যতা।

এই রহস্যজনক ঘটনার আদি অন্ত খুঁজে বের করার জন্য যখন মোগল ফৌজদাররা বৈঠকে মিলিত হল তখন ঐ পাহাড়ের বুকে শত্রুর কামান গর্জন করে উঠল। অশ্বারোহী সৈন্যরা পাহাড় ঘিরে ফেলল। গিরিপথগুলো দুর্ভেদ্য করে তুলল।

রহস্যটা আবিষ্কৃত হল মোগল সৈন্যদের কাছে। ধূর্ত শিবাজী ওদের বিভ্রান্ত করেছে। শিবাজীর বুদ্ধি কার্যকরী হয়েছে। মোগল সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ওদের মূল ঘাঁটি থেকে।

রসদ নেই সঙ্গে। অস্ত্র-শস্ত্র নেই কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ করার মতো।

ওরা জানত খাদ্য আসবে মূল ঘাঁটি থেকে। প্রয়োজনে অস্ত্র-শস্ত্র আসবে প্রধান দুর্গ থেকে।

এখন তো সে রাস্তা রাখে নি। এখন যুদ্ধ করা মানে নিশ্চিত পরাজয়।

তবু শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হল মোগল সৈন্যরা। আশা করেছিল কিছু সাহায্যের। কিন্তু সে সাহায্য তো এলই না বরং সে দিক থেকে অসহায় আর্তনাদ ভেসে এল।

অল্পক্ষণ যুদ্ধ করে পরাজয় বরণ করে নিল মোগল সৈন্যরা। কিছু মরল। কিছু বন্দী হল।

দু দিকে দুটো বাহিনী একই সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছে শায়েস্তা খাঁর দুর্গের উপর। সেখানেও চতুর শিবাজী একদল সন্ন্যাসী অনুচর নিয়ে একটা বরযাত্রী দলের সঙ্গে মিশে দুর্গ আক্রমণের সুযোগ করে নিয়েছিল। সে আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না মোগল বাহিনী। বিপর্যস্ত হয়ে গেল। মাত্র দুদিন যুদ্ধ চলেছিল ।

এ দুঃসংবাদ আগ্রা পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে নতুন হুকুম এসেছে। সে হুকুম একেবারে অপ্রত্যাশিত। শায়েস্তা খাঁকে বদলী করে দিয়েছ দিল্লীর বাদশাহ। দাক্ষিণাত্যে আর নয়। একদিনও বিলম্ব নয়। যদিও বাদশাহের সম্পর্কে মাতুল শায়েস্তা খাঁ। তবু ক্ষমা না করে মাতুলকে বাংলায় পাঠিয়ে দিল আওরঙ্গজেব।

শায়েস্তা খাঁর জায়গায় নতুন সেনাপতি প্রেরিত হল। নতুন শাসক।

শায়েস্তা খাঁর নির্বুদ্ধিতা যেখানে পরাজয়ের গ্লানিকে স্বাগত জানিয়েছে, পুণা হস্তচ্যুত হবার সুযোগ করে দিয়েছে, অম্বররাজ জয়সিংহের সাহস এবং বুদ্ধিমত্তা সেখানে শিবাজীকে নাজেহাল করতে নিশ্চয় সফল হবে এবং মোগল শাসন বিস্তারে সহায়তা করবে এই প্রতীতি নিয়েই প্রেরিত হল মহারাজ জয়সিংহ।

সঙ্গে আরও একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি। দিলীর খাঁ এল জয় সিংহের সঙ্গে।

শায়েস্তা খাঁর পরাজয়ের খবর আদিল শাহকে যতটা হতাশ করে দিয়েছিল, মহারাজ জয়সিংহের আগমন ঠিক ততটা সাহস দিল।

গত তিন দিন একটা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কেটে গেছে। প্রতিটি পল অনুপল অতিবাহিত হয়েছে একটা দুঃস্বপ্নের মতো। শত্রুপক্ষ এত শক্তিমান—এত চতুর ! শায়েস্তা খাঁর মতো এত বড় যোদ্ধাকে যুদ্ধ করার সুযোগই দিল না? অথচ এই শায়েস্তা খাঁ প্রথমে এসেই কল্যাণ পুনরধিকার করে পুণা থেকে শিবাজীকে বিতাড়িত করে পুণাকেই ঘাঁটি করেছিল।

কথাগুলো যখনই মনে এসেছে তখনই বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করেছে। কোন কাজে মন দিতে পারে নি। পারে নি সুস্থ মনে রণদুল্লার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে। অথচ পরামর্শ করার দরকার ছিল।

বিজাপুর দুর্গও যদি আক্রমণ করে শিবাজী তাহলে কি করা হবে সে সম্বন্ধে রণদুল্লার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার ছিল। কিন্তু কেন কে জানে উৎসাহ বোধ করল না আদিল শাহ।

একটা নিরুত্তাপ ঔদাসিন্য যেন তাঁর দেহমনকে নিস্তেজ করে রাখল। রক্তের মধ্যে একটা জমাট বাঁধা বরফের শীতলতা অনুভব করল।

তারপর যখন খবর এল জয়সিংহ আর দিল্লীর খাঁ এসে হাজির হয়েছে সম্রাটের আদেশে, তখন দেহের সব অবসাদ সব ক্লান্তি কাটিয়ে জলসা জম-জমাট করার হুকুম দিয়েছে।

চোখের সামনে জাফরাণী পর্দা নড়ে উঠল। উঁকি দিল সুন্দর দুখানা পা। নিটোল সেই পা দু'খানি গালিচা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরে গেল।

তবলচি বোল তুলল, সারেঙ্গীয়া সুরের মোহাঞ্জন ছড়িয়ে দিল। জলসাঘরের আয়তনে ধীরে ধীরে সুর ফুটল।

মরিয়মের ঘাঘরা ফুলে উঠল; ওড়নার প্রান্ত বাতাসে নিজের কলেবর সম্প্রসারণ করল। মখমলের তাকিয়ায় আদিল শাহ মাথা দোলাতে লাগল। তালে তালে মাঝে মাঝে বলতে লাগল : বহুত আচ্ছা মরিয়ম...বহুত আচ্ছা।

মরিয়ম যেন পাগল হয়ে নাচে। আদিল শাহের আবেগ তাকে অনুপ্রাণিত করে। রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় ক্ষেপা বাতাস। নাচের ঘূর্ণি তোলে মরিয়ম। চোখের ইঙ্গিত ছুরির ফলার মতো ছুঁড়ে মারে আদিল শাহকে লক্ষ্য করে। সে কটাক্ষের ফলা আদিল শাহের বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়।

মরিয়ম নাচে। বিরামহীন নৃত্য। ওর জলসা ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে বেগম মহল পর্যন্ত সচকিত করে তুলল।

খেয়াল নেই মরিয়মের কোন দিকে ; ওর একমাত্র লক্ষ্য একমাত্র উদ্দেশ্য আদিল শাহকে আনন্দ দেওয়া। ওর মনের ব্যথা বেদনাহত শোক ভুলিয়ে দেওয়া।

মরিয়ম তা পারে, তার প্রমাণ দিয়েছে এর আগে। আর একবার দিল।

নাচগানের মায়ায় সম্মোহিত হয়ে রইল আদিল শাহ। আর ঘন ঘন মাথা নাড়া স্তিমিত হয়ে এল। মেরুদণ্ড বেঁকে গেল।

মুখের বাহবা বাহবা শব্দ স্তব্ধ।

তখন ক্ষান্তিহীন নাচ, তবলচির হাতের কসরত, সারেঙ্গীয়ার সুরসাধনা সমানে চলেছে।

মনে হচ্ছিল যেন প্রতিযোগিতা চলছে ওদের মধ্যে। পরীক্ষা চলছে শক্তির। কার দম বেশি পরখ করে দেখতে চাইছে ওরা।

সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল মরিয়ম। তবলচির হাতের বোল যেন

প্রাণহীন, সারেঙ্গী সামান্য বেসুরো। একটানা নয়—মাঝে মধ্যে। সমঝদার শ্রোতা না হলে ধরতে পারে সাধ্য কার ?.

তাও স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমশ। মরিয়মের ঠোঁটে পরিহাস তরল হাসির ইশারা। চোখের ইশারায় থামতে অনুরোধ জানাচ্ছে। ওদের সম্মান বাঁচাতে আবেদন করছে ইঙ্গিতে।

হয়তো সে আবেদনে সাড়া দিতে গিয়ে নাচ থামাল মরিয়ম।

ঘরের ভেতর স্তব্ধতা নেমে আসার আগেই তবলচি বলল: হেরে গেলাম মরিয়ম।

সারেঙ্গীয়া সকরুণ স্বীকারোক্তি করল: আমিও পরাজিত মরিয়ম।

মরিয়ম শুধু নিঃশব্দে হাসল।

সোজা হয়ে বসল আদিল শা। নেশারক্ত চোখ তুলে তাকাল তবলচি আর সারেঙ্গীয়ার দিকে।

শুধু তোমরা নয় বিলায়েৎ খাঁ আদিল শাও পরাজিত। মরিয়মবাঈ তাকেও জয় করেছে।

শুধু আদিল শা নয় অযোধ্যাপ্রসাদও মাথা দোলাতে দোলাতে বলল: মরিয়ম সুযোগ পেলে দিল্লীর সম্রাটকেও জয় করতে পারে।

বহুৎ সাচ্চা বাত অযোধ্যাপ্রসাদ···বহুৎ সাচ্চা বাত। হা, হা, ·· উচ্চ রবে হেসে উঠল আদিল শা।

এক সময় কণ্ঠস্বর নীচে নামিয়ে বলল: একটা মতলব মাথায় এল মরিয়ম।

সেটা কি জাঁহাপনা?

আচ্ছা মরিয়ম!

জাঁহাপনা!

তুমি কি পারবে শিবাজীকে জয় করতে?

ওকি কথা জাঁহাপনা! দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেব সর্বশক্তিমান। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দাক্ষিণাত্যের ত্রিধাবিভক্ত শক্তি। সে অজেয় শক্তি যার কাছে সন্ত্রস্ত, তাকে আমি কি করে জয় করব।

কেন, তোমার এই দিল জখম করা নাচ, প্রাণ উতল করা গান?

নাচ আর গান দিয়ে আদর্শকে জয় করা যায় না জাঁহাপনা।

তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যায় না মরিয়ম?

হয় না জাঁহাপনা।···জলসাঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত একবার পায়চারী করে এল মরিয়ম: মৌলানা আহম্মদের মেয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ওকেও তো উপহার হিসেবে পেয়েছিল শিবাজী। কিন্তু মারাঠা বীর উপহারদাতাকে কঠোর শাস্তি দিয়ে চাকুরী থেকে পর্যন্ত বিতারিত করে সে মেয়েকে বিজাপুরে পাঠিয়ে দিয়েছে না?

আদিল শা অবাক। এ কি বলছে মরিয়ম! এ খবর ও কোথায় পেল?

অযোধ্যাপ্রসাদ!

আদিল শা আর্তভাবে ডাকল।

জাঁহাপনা।

বিলায়েৎ খাঁ!

তোমরা এখন যেতে পার।

মরিয়ম নৃত্যভঙ্গিমায় আদিল শার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে বলল: আমি কি যেতে পারব জাঁহাপনা?

না, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বিলায়েৎ খাঁ আর অযোধ্যাপ্রসাদ বেরিয়ে গেল।

তুমি কার কাছে শুনলে ঐ খবর মরিয়ম?

কেন, ঐ খবর কি খুব গোপনীয় ছিল জাঁহাপনা?

গোপনীয়ই তো! ও খবর প্রচারিত হলে আমার প্রজাদের মনে শিবাজী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগবে। তাই এ খবর আমি গোপন করতে চেয়েছিলাম মরিয়ম!

আপনি গোপন করতে চেয়েছেন মনে মনে, কিন্তু কাজে প্রচার করে দিয়েছেন।

কি তুমি আবোল তাবোল বকছ মরিয়ম ?

মরিয়ম আবোল-তাবোল বকে জাঁহাপনা ? এই জলসাঘরে বসেই শুনিয়েছেন আপনি।

লজ্জা পেল আদিল শা। হাসল মরিয়মের মুখে তাকিয়ে। বলল ঃ তাহলে নেশার ঘোরে বলে ফেলেছি মরিয়ম। নেশার ঘোরে প্রকাশ করেছি সেই গোপন খবর।

গলার স্বরে আবেগ, কথায় দরদ মিশিয়ে আদিল শা বলতে লাগল। দু'হাত এক সঙ্গে এগিয়ে দিল মরিয়মের দিকে—এস মরিয়ম, আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়। একবার আমায় তোমার উষ্ণ দেহের আলিঙ্গনে কৃতার্থ কর।

জাঁহাপনা।

মরিয়মের শান্ত করুণ কণ্ঠ বেজে উঠল।

মরিয়ম!

আমি না আপনার বাঈজী ?

না, না মরিয়ম, তুমি বাঈজী নও, তুমি আমার···

বেপরোয়া পুরুষের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল আদিল শা। দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল মরিয়মকে ধরবার জন্য। মরিয়ম পেছু হটতে লাগল।

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল মরিয়ম। পর মুহূর্তে নতুন সাহসে বুক বাঁধল। সব ছলাকলা, বাঈজীর সব কৌশল প্রয়োগ করে বাঁচবার চেষ্টা করবে। আদিল শার মনের লালসার আগুন নিভিয়ে দেবে।

লীলায়িত ভঙ্গিতে আপন দেহবল্লরী আদিল শার কাছে টেনে এনে অপূর্ব ভ্রূ-বিলাসের মোহ সৃজন করে মরিয়ম বলল ঃ জাঁহাপনা! মনে পড়ে সেদিনটির কথা যেদিন প্রথম দেখা হয় আমার আর আপনার ?

উল্লসিত হয়ে ওঠে আদিল শা। মুহূর্তের জন্য বিভ্রম দেখা দিল

মনে। অকস্মাৎ দেহের শিরা উপশিরায় এক অনাস্বাদিত উন্মাদনা জেগে উঠল। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অন্তে বুঝি সেই বহু প্রত্যাশিত দিনটি এল।

দুটো চোখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় যে একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা ওর মনকে সজোরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। সেই ইচ্ছার তাড়নাতেই অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে রূপময়ী বাঈজীর লাস্যময় দুটি চোখের ঘন নীল তারার দিকে।

সে দিনটি আমি ভুলি নি মরিয়ম। তোমার সে দিনের চোখ জুড়ানো নৃত্য, মন কেমন করা সঙ্গীতলহরী, কোন দিন ভুলবো না মরিয়ম।

আমার মুখের ওড়না সরিয়েছিলেন মনে আছে?

আছে।

বাঈজীর প্রথম ওড়না তোলার মূল্য আপনি দেবেন কথা দিয়েছিলেন মনে পড়ে?

পড়ে মরিয়ম। সে জন্যেই তো যৌবন জ্বালায় উন্মাদ হয়েও তোমাকে বুকে টানি নি।

সুলতানের যোগ্য আচরণই দেখিয়েছেন। তার জন্য ঋণী থাকব।

কিন্তু আজ আর আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারছি না বুলবুল। আজ আমার ধৈর্যের, সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। তাই···

তাই এই নির্জন রাত্রির অসহায় মুহূর্তে মরিয়মের নারীত্বকে ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে মতিবাঈয়ের সামনে দিয়ে আসা প্রতিশ্রুতির খেলাপ করতে চান জাঁহাপনা?

দুটো করুণ চোখের দৃষ্টি আদিল শার চোখে স্থির রেখে আস্তে··· খুবই আস্তে বলল মরিয়ম।

মতিবাঈয়ের নাম শুনে চমকে উঠল আদিল শা। ভয়ে দু'হাত পেছিয়ে গেল। আপন মনে বিড় বিড় করে বলল: মতিবাঈয়ের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি! সত্যি কি তাহলে সে

প্রতিশ্রুতির খেলাপ করছি ? ছিঃ ! ছিঃ ! আমি না বিজাপুরের *হর্তা কর্তা, আমি না শিবাজীর মত মারাঠা বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী ?*

কৌশল জয়সিংহেরও কম জানা ছিল না। তা না হলে শিবাজীকে আগ্রা নিয়ে যেতে পারে।

নতুন খবর এসেছে বিজাপুরে। জয়সিংহ শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি করেছে। নিজের রণনৈপুণ্য এবং সাহস দেখিয়ে শিবাজীকে সন্ধি করতে বাধ্য করেছে। মাত্র বারটি দুর্গ বাদশা হাতে রেখে বাকী সব ছেড়ে দিয়েছে। আদিল শা সে খবর শুনে উৎফুল্ল। আরও একটি ভালো খবর শুনল মরিয়ম। খবরের পেছনে যে সত্য আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নিজের চোখে যা দেখেছে তার সঙ্গে এ খবরের সামঞ্জস্য রয়েছে।

প্রথম যে দিন লুৎফাকে বিলায়েৎ খাঁর পাশে উপবিষ্ট দেখে সে দিনই কেমন যেন একটা সন্দেহের বীজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল মরিয়মের মনের মাটিতে।

জ্যোৎস্না-ধৌত আকাশ। বাঁদী মহলের পাশে সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ে চাঁদের আলোর লুকোচুরি খেলা চলছিল। জলের উপরে কখনও রূপালী রেখা চিক্‌চিক্ করছিল, কখনও নিকষ কালো দেখাচ্ছিল।

বিলায়েৎ খাঁ মাঝে মাঝে গিয়ে বসত ঐ জলাশয়ের ধারে। হয়তো শিল্পী মন বলেই ভালো লাগত ঐ পরিবেশ। জলাশয়ের জল, চাঁদের আলো....সে জলে আদিল শাহের সুরম্য অট্টালিকার ছায়া কাঁপত। তাই বুঝি বা দেখত বিলায়েৎ খাঁ। হয়তো সে মুহূর্তে ওর মনের সামনে ভেসে আসত মথুরার কাছাকাছি একটি গ্রাম।

সে গ্রামের কোন লাজুক মেয়েকে কি কোনদিন ভালোবেসেছিল বিলায়েৎ খাঁ ? তাহলে ওখানে বসে বসে কি ভাবে লোকটা ?

যতদিন বিলায়েৎ খাঁকে ওখানে দেখেছে মরিয়ম ততদিন ঐ একটি কথাই ভেবেছে। ঐ একটি কথারই উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছে নিজের মনের কাছে। কিন্তু কোন উত্তর পায় নি।

কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করেও কিছু জানতে পারে নি। নীরবে হেসেছে আর আস্তে আস্তে মাথা তুলিয়েছে। কোন ব্যথার সাগর উথলে উঠলে ঐ জলাশয়ের ধারে গিয়ে বসত কে জানে?

হঠাৎ একদিন মরিয়মের দৃষ্টি আকর্ষণ করল অন্য এক দৃশ্য। বিলায়েৎ খাঁ একা নয়। পাশে বসে আছে সেই সুন্দরী বাঁদী। ঝরনার মত চঞ্চল স্বভাবের রূপসী লুৎফা।

প্রথমটা অবাক হলেও শেষ পর্যন্ত কারণ খুঁজে পেয়েছিল। যৌবনের তুরন্ত আকর্ষণ তু'জনকে কাছাকাছি নিয়ে গেছে হয়তো। অপূর্ণতার অতৃপ্তি তুটো মনকে মোহগ্রস্ত করেছে।

ভালোই হয় ওদের যদি মিলন হয়, যদি একসূত্রে গ্রথিত হয় তুটি হৃদয়। আনন্দই পাবে মরিয়ম। ঐ সারেঙ্গীর সুর সাধকের বিষণ্ন গম্ভীর মুখ দেখলে কেমন যেন মায়া হয় মরিয়মের।

আজ সেই সারেঙ্গীয়া হঠাৎ ব্যাকুল আবেদন পেশ করল।

আমাকে বাঁচাও মরিয়ম।

মরিয়ম প্রথমটা চমকে উঠল। কি চাইতে এসেছে সারেঙ্গীর জাতুকর?

তোমার কোন ক্ষতি হবে না মরিয়ম। বরং খোদার কাছে নজরানা পাবে। আমার একটা উপকার কর তুমি।

কি করতে হবে খাঁ সাহেব?

আমি ঘর বাঁধতে চাই মরিয়ম। তোমার সাহায্য চাই।

বুকের ভেতরে আনন্দের নুপূর ধ্বনি শুনতে পেল মরিয়ম। ঘর বাঁধবে বিলায়েৎ খাঁ! প্রেমবন্যার উদ্দাম স্রোতকে ঘরের আয়তনে বেঁধে শান্ত সরোবর করবে আদিল শার জলসাঘরের সারেঙ্গীওয়ালা!

মরিয়মের মনটা যেন আনন্দে নৃত্য করে উঠল। এ সাধ এ বাসনা তো ওর কত কালের।

অপরের জীবনের পূর্ণতার সম্ভাবনার মধ্যে নিজের মনের অপূর্ণতার হাহাকারের সান্ত্বনা খুঁজে পেল মরিয়ম। বলল: কাকে নিয়ে ঘর বাঁধবেন খাঁ সাহেব? বলুন আমাকে কি করতে হবে? আপনার ঘর বাঁধার পথে আমি কি করতে পারি?

আমি লুৎফাকে সাদি করব।

মরিয়মের মুখের আয়তনে হাসির রেখা ফুটল। ছুটো চোখ বুঁজে ফেলল। অনুভব করতে চাইল আনন্দের অনাস্বাদিত এক শিহরণ। এক সময় চোখ খুলে বলল: আপনি কি ওকে বিবির মর্যাদা দিতে পারবেন খাঁ সাহেব?

আলবত পারব মরিয়ম। ওর সঙ্গে আমার জীবনের মিল রয়েছে। ছু'জনের জীবনে একই আঘাত এসেছিল। একইভাবে ভেঙেছে ছু'জনেরই সুখের ঘর। কাজেই আমরা পারব সহজে মিলতে।

অর্থপূর্ণ চোখ তুলে বিলায়েৎ খাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মরিয়ম। এক সময় বলল: আপনি তাহলে ঘর বেঁধেছিলেন একদিন খাঁ সাহেব?

বেঁধেছিলাম মরিয়ম। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বিলায়েৎ খাঁ বলতে লাগল: মথুরার চাষীর ছেলে বিলায়েৎ খাঁ সাদি করেছিল গোকুলের চাষীর মেয়ে। মাত্র তিন বছর, তার মধ্যেই সব শেষ। বাড়িতে ডাকাত পড়ল এক রাতে। ঘরের অন্যান্য দামী জিনিষ পত্রের সঙ্গে গোকুলের মেয়ে আমিনাও চলে গেল ডাকাতদের সঙ্গে।

ছুটো চোখ বড় হল মরিয়মের। বিস্ময় আর কৌতূহলে কথা হারিয়ে ফেলল।

বিলায়েৎ খাঁর চোখের প্রান্তে জল, তবু বলে চলল: অনেক খুঁজেছিলাম মরিয়ম। মথুরা থেকে বৃন্দাবন, বৃন্দাবন থেকে আগ্রা জয়পুর বাঙ্গালোর কোথাও বাকি রাখি নি। কিন্তু পেলাম না কোথাও।

তারপর ?

অভিভূত মরিয়ম প্রশ্ন করল।

তারপর গেলাম লক্ষ্ণৌ। চুণীবাঈয়ের ঘরে নিলাম কাজ, সুরা ঢেলে দিতাম, সরবতের গ্লাস নিয়ে রাখতাম জলসায়। সুগন্ধি আতর ছড়িয়ে দিতাম ঘরের জাজিমে। আর অবসর সময়ে চুণী-বাঈয়ের সারেঙ্গীওলার ঘরে গিয়ে বসতাম। তার কাছ থেকে পাঠ নিতাম সারেঙ্গীর। বুড়ো সারেঙ্গীওয়ালা বলত : সাবাস বেটা, খাসা হাত তোর। তুই পারবি।

শুনতে শুনতে মরিয়মের মুখের বিস্ময় দূর হয়ে গেল। আবার দেখা গেল হাসির দীপ্তি।

হাত পাকা হতেই ঐ চাকুরী নিলাম। ঘুরে বেড়ালাম এক দেশ থেকে অন্য দেশ, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য। কোথাও স্থির হল না মন। ভুলল না বিবেক। শেষ পর্যন্ত এলাম বিজাপুর। আদিল শার জলসামহলে নিলাম চাকুরী। তুমি এলে তারও পরে।

আর লুৎফা ?

লুৎফাকে আবিষ্কার করলাম সে দিন। বছরখানেক মাত্র আগে। তোমার সঙ্গে কি সব কথা বলে যখন ফিরে যাচ্ছিল।

কি অদ্ভুত মিল আপনাদের দুজনের মধ্যে !

আমার বিশ্বাস আমাদের ঘর বাঁধা সার্থক হবে মরিয়ম।

কিন্তু সুলতান কি বাদ সাধবে না ? মরিয়মকে চিন্তিত দেখাল।

সে জন্যেই তো সাহায্য চাইছি মরিয়ম। তুমি আমাদের ঘর বাঁধার পথ করে দাও।

কি ভেবে সোজা হল মরিয়ম। চোখে মুখে দৃঢ়তার আলো ভাসল। বলল : তাই দেব খাঁ সাহেব। আদিল শা যদি বাধা দেয় —যদি আপত্তি তোলে, তোমাদের পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেব।

পরের রাত্রেই মরিয়ম আনন্দের খবরটি নিয়ে লুৎফার কাছে গেল। সঙ্গে বিলায়েৎ খাঁ।

লুৎফা শুয়ে পড়েছিল। নির্জীবের মতো পড়ে ছিল বিছানায়।

কাছে গিয়ে বসল মরিয়ম। মাথায় হাত রাখল। চুলের অরণ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করল।

জেগে উঠে মাথা তুলল লুৎফা।

কে?

আমি, মরিয়ম।

বাঈজী সাহেবা? এখানে কি মনে করে?

তোমার কাছে এসেছি লুৎফা।

তোমার মেহেরবান।

সঙ্গে কাকে এনেছি দেখেছ?

পেছনে তাকিয়ে উঠে বসল লুৎফা। সারা দেহে মসলিনের আচ্ছাদন ছড়িয়ে দিল। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল ঃ ওকে কেন এনেছ বাঈজী সাহেবা?

ওকে এনেছি তোমার মনের ঘুম ভাঙাতে।

হাসল লুৎফা। হাসল মরিয়মও।

তোমাদের ঘর বাঁধার সম্মতি আদায় করে এনেছি সুলতানের কাছ থেকে। কিন্তু এখানে নয়।

তবে কোথায় বাঈজী সাহেবা?

বিজাপুর থেকে দূরে অন্য কোন রাজ্যে। রাজি আছ?

লুৎফা তাকাল বিলায়েৎ খাঁর মুখে। বিলায়েৎ খাঁ মরিয়মের মুখে।

আমি অনেক চেষ্টা করেছি খাঁ সাহেব। আপনাদের সুখের ঘর আমার চোখের সামনে থাকলে আমিও সুখী হতাম। আমারও ভালো লাগত। কিন্তু কোন উপায় নেই। আপনারা চলে যান খাঁ সাহেব।

যাব?

বিলায়েৎ খাঁ সঙ্কোচ এবং দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে জানতে চাইল।

চল্লিশোর্ধ্ব বিলায়েৎ খাঁকে অনেকটা ছেলেমানুষের মত দেখাল।

যান খাঁ সাহেব। ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। এ দেশের বুক থেকে নাচ গানের আসর তুলে দেওয়া দিল্লীর বাদশাহের ক্ষমতার বাইরে। আপনি ভালো বাজাতে পারেন। নিত্য নতুন সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করতে পারেন। আপনার চাকুরীর অভাব হবে না।

কিন্তু তোমার কি হবে মরিয়ম ?

আমার জন্য নতুন সারেঙ্গীওয়ালা আসবে। আমার জন্য ভাববেন না খাঁ সাহেব। আমার প্রতি আপনার প্রীতি বাৎসল্যের। বাৎসল্যের চেয়ে মধ্যজীবনের মহব্বত অনেক বড় খাঁ সাহেব। আপনি যান। যদি সময় পান, যদি মনে থাকে মরিয়ম বাঈকে, তবে বৎসরান্তে একবার দেখা দিয়ে যাবেন।

লুৎফার দিকে তাকাল মরিয়ম। ওর চোখে জল দেখে বলল : তুই কাঁদছিস লুৎফা ?

কাঁদছি তোমার জন্য বাঈজী সাহেবা।

কেন, আমি তো বেশ আছি। বহাল তবিয়তে। থাকবও।

থাকতে কি পারবে বাঈজী সাহেবা ? বিজাপুরের নসিবে কী আছে খোদাতাল্লা ছাড়া আর কেউ জানে না।

বিজাপুরের নসিবের সঙ্গে যখন আমার নসিব মিলিয়ে দিয়েছি, বিজাপুরের যা হবে আমারও তাই হবে। আর সত্যি সত্যি যদি কোন দিন দুর্দিন আসে তখন তোর মেহমান হব, তখন তুই আমাকে মাথা গুঁজবার জন্য একটুকু জায়গা দিস।

দেব বাঈজী সাহেবা, নিশ্চয় দেব। আমি শুধু অপেক্ষা করব সেই শুভ দিনটির জন্য। যে দিন তুমি আমার ঘরে পদধূলি দিতে যাবে।

মরিয়ম লুৎফার হাত ধরে তুলে দিয়ে বলল : আর দেরী করিস নি

লুৎফা। রাতের অন্ধকার থাকতে তোরা চলে যা। সুলতানের কর্মচারীদের মধ্যে যারা তোকে চেনে তাদের চোখ এখন ঘুমের ঘোরে অচেতন। এই উপযুক্ত সময়। কারুর আলোচনার বর্ত্তমান খোরাক না হতে চাস তো এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়।

লুৎফা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল বিলায়েৎ খাঁর দিকে।

মরিয়ম বলল ঃ খাঁ সাহেব তৈরী হয়েই এসেছেন ভাই লুৎফা।

ধীরে ধীরে যাত্রা করল ওরা। মরিয়ম এগিয়ে দিতে গেল ফটকের বাইরে। দ্বাররক্ষী পথ আগলাতে পারে—হাজারও প্রশ্নে নাজেহাল করতে পারে।

ফটকের বাইরে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল লুৎফা ও খাঁ সাহেব। দুজনেরই চোখে জল।

লুৎফা কুর্নিশ করল মরিয়মকে। মরিয়ম করল খাঁ সাহেবকে।

কোথায় থাকেন খবর পাঠাবেন আমাকে।

মাথা ঝুলিয়ে সম্মতি জানাল খাঁ সাহেব। তারপর পা বাড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল লুৎফা। খানিকটা গিয়ে একবার ফিরে তাকাল—পরে খাঁ সাহেব। দুজনেরই চোখ চিকচিক করছে। তারপর একটু একটু করে গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওদের ছায়া।

আদিল শা বড় ব্যথা পেয়েই খবরটি পৌঁছে দিল মরিয়মের কাছে। মরিয়ম বুঝতে পারে না কেন সব খবর ওর কাছে পৌঁছে দিয়ে যায় সুলতান।

লোকটা আসলে বোকা। মরিয়মের মুখের পরিবর্তন কি দেখতে পায় না মানুষটা? শিবাজীর অমঙ্গল হবে :এমন কোন খবর দিলে মরিয়মের মুখে যে অন্ধকারের ছায়া ঘনায় তা কি লক্ষ্য করে না সুলতান?

আশ্চর্য মানুষের মন। যাকে ভালোবাসে, যার প্রতি থাকে সামান্যতম দুর্বলতা, তাকে কোন মতেই অবিশ্বাস করতে পারে না।

মরিয়মের প্রতিও আছে সুলতানের দুর্বলতা। ওকে পাওয়ার লোভ আদিল শার পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। মাঝে মাঝে সে লোভ উগ্র হয়ে ওঠে। জোর খাটাতে চায়। কিন্তু বড় শেয়ানা মরিয়ম। ছলা কলা অনেক জানা আছে ওর।

কিন্তু কতদিন পারবে এ ভাবে বাঁচতে? কত দিন ফাঁকি দেবে ঐ সুরাসক্ত লোকটাকে?

তাছাড়া নিজের মনের কাছেই বা কি কৈফিয়ৎ দেবে সে? মাঝে মাঝে ওর নিজের মনও কি দুর্বল হয়ে পড়ে না? সে যা করে তা তো আসলে আত্মপ্রবঞ্চনা। কোন বাঈজী ঐ নিরাসক্ত জীবন যাপন করেছে নির্জন জলসাঘরে সুলতানের আবেদন নিবেদন উপেক্ষা করে?

মরিয়ম কি পারবে বেশি দিন এ ভাবে কাটিয়ে দিতে? নিজের মন কি কোন দিন বিদ্রোহ করবে না? পাওয়ার অপূর্ণতা কি সংযমের শেষ নোঙরকে ছিঁড়ে ফেলবে না? হয়তো ফেলবে, হয়তো ফেলবে না।

সুলতানকে এড়িয়ে চলে মরিয়ম। এড়িয়ে চলে ওর মহব্বতের গুণগুণানিকে।

কিন্তু সুলতান আজও প্রত্যাশার আলোটিকে জ্বালিয়ে রেখেছে নিজের মনের কোণে। ওর বিশ্বাস একদিন না একদিন ধরা দেবে মরিয়ম। আদিল শার প্রতীক্ষাকে ভরে তুলবে চূড়ান্ত সার্থকতায়।

তাই সব খবর দেয়, সব জানিয়ে যায় রাজ্যের কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে।

কোন দিন খুশীর খবর, কোন দিন বেদনার খবর বহন করে আনে সুলতান। গতকাল সুলতান জানাল মাঙ্কাপুরের গিরিসঙ্কটে শিবাজীর কি হাল হয়েছিল। হারতে হারতে বেঁচে গেছে শিবাজী।

তাও—বাজী প্রভু নামক এক সেনানীর কৃতিত্বের এবং সাহসের বিনিময়ে নিজে নিহত হয়েও বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে শিবাজীকে।

আজকের খবর একেবারে অপ্রত্যাশিত।

দিন কয় আগে অম্বররাজ জয়সিংহের চক্রান্তে শিবাজী আগ্রায় গিয়ে হাজির হয়েছে।

অবিশ্যি ওকে বলা হয়েছিল সন্ধির সর্ত নিরূপণের জন্য আওরঙ্গজেব ওর সঙ্গে বসতে চায়।

শিবাজীও এ রকম একটা মুহূর্তের প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল। যুদ্ধ বিগ্রহে ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করতে করতে এমন দিন আসবে যখন শিবাজীকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা চিন্তা করবে মোগল সম্রাট।

মন্দ কি, যদি মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয় মোগল শক্তি। মারাঠা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে মেনে নিয়ে সন্ধি করতে আপত্তি কি!

কিন্তু আগ্রায় গিয়ে ভুল ভাঙ্গল শিবাজীর।

খুব খারাপ ব্যবহার পেল বাদশাহের কাছ থেকে। এবং সে বুঝতে পারল তাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে।

নিজের জন্য যত না তার চেয়ে বেশি ভাবিত হল স্নেহাস্পদের জন্য। সঙ্গে তার কিশোর সন্তান শম্ভাজী। মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেল এক অদ্ভুত কৌশল।

অসুখের খবর রটে গেল আগ্রার ঘরে ঘরে।

আওরঙ্গজেবও ভাবিত হয়ে পড়ল। ওরই বন্দীশালায় যদি শিবাজীর মৃত্যু হয় অপবাদ নিতে হবে ওকে।

তাই আওরঙ্গজেব নিজের অমাত্যবর্গকে পাঠিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছিল। সব রকম ব্যবস্থাদি করছিল।

সে সুযোগের চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করল শিবাজী। মারাঠাদের রোগ হলে, সে রোগ সারানোর জন্য কয়েকটি নিয়ম কানুন মেনে চলে ওরা। এখন দিল্লীর বাদশাহ যদি সে নিয়মে বাধা সৃষ্টি করে, যদি

সে নিয়ম কানুন পালন করবার মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য না করে তাহলে শিবাজীর রোগ মুক্তি সম্বন্ধে ওরা সন্দিহান হবে।

আওরঙ্গজেব স্বচ্ছন্দ চিত্তে সম্মতি দিল। যতই ধর্মান্ধতা থাক মোগল সম্রাটের মনে, আজ শত্রুকে বন্দী করে তাঁর ধর্মীয় আচরণকে গলা টিপে হত্যা করতে পারবে না।

তখন শিবাজী শুরু করল মিষ্টান্ন বিতরণ। ধর্মীয় প্রথার নামে আগ্রার সন্ন্যাসী, ফকির, আমির ওমরাহদের বড় বড় ঝুড়ি ভর্তি ফল আর মিষ্টান্ন পাঠাতে শুরু করল।

নজরদাররা প্রথম প্রথম ঝুড়িগুলো খুলে পরীক্ষা করত। যখন স্থির নিশ্চিত হল যে, ফল আর মিষ্টান্ন ছাড়া আর কিছু নেই ঝুড়ির মধ্যে তখন থেকে বন্ধ করে দিল। আর, সে সুযোগে একদিন শূন্য ঝুড়ির মধ্যে বসে শিবাজী এবং শিবাজীর পুত্র আগ্রার বাইরে চলে গেল।

মোগল শক্তি যখন জানতে পারল যে শিবাজীর চালাকীর কাছে ওদের হার হয়েছে তখন শিবাজী অনেক দূরে। মহারাষ্ট্রের দিকে অনেকখানি পথ পেছনে রেখেছে। আগ্রাকে অনেক পেছনে রেখে এগিয়ে গেছে।

একটা রোমাঞ্চকর খবর। বিস্ময় ও উত্তেজনায় ভরা। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে শুনল বিজাপুরের মানুষ।

শুনল মরিয়ম। শুনতে শুনতে ওর মুখ আরক্ত হল। ওর মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে আগ্রা থেকে মহারাষ্ট্রের পথে। কে জানে কোন পথ ধরে শিবাজী দেশে ফিরছে? পথে কত কষ্ট কত বাধা পাচ্ছে কে জানে? শেষ পর্যন্ত দেশে পৌছাতে পারবে কিনা কে জানে?

মরিয়ম?

কাঁধের উপর হাত রাখতেই চমকে ঘুরে দাঁড়াল মরিয়ম।

বলুন।

শিবাজী কি এবার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবে না? চরম আঘাত কি হানবে না বিজাপুরের উপর?

অসহায় শিশুর মত কণ্ঠস্বরে ভয় আর শঙ্কা মিশিয়ে আদিল শা প্রশ্ন শুরু করল।

বিজাপুরের উপর কেন হানবে সুলতান? সে তো মোগল শক্তির উপর শোধ নিতে চাইবে।

মোগল শক্তির উপর শোধ নিতে গিয়ে সে কি মোগলদের মিত্র শক্তিগুলোকে রেহাই দেবে?

আমি একটা কথা বলব সুলতান?

বল মরিয়ম, বল—

যদি অভয় দেন বলতে পারি। কারণ আমি একজন সাধারণ নর্তকী। রাজনীতির মত শক্ত ব্যাপারগুলো মাথায় ঢোকে না। ঢোকার কথাও নয়। তবে আমার মনে হয় বিজাপুর শক্তি মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিলে মহারাষ্ট্রের কল্যাণ হবে।

কথাগুলো একটানা বলে একদৃষ্টে আদিল শাহের দিকে তাকিয়ে রইল মরিয়ম। লক্ষ্য করতে লাগল ওর ভাবান্তর।

মরিয়মের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল আদিল শাহ। খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলল: এটা একটা কী কথা বললে মরিয়ম? বিজাপুরের সুলতান বন্ধুত্ব করবে ঐ দস্যুটার সঙ্গে? ওর কী আছে যে ও বেশি দিন লড়াই করবে আমাদের সঙ্গে? তুমি এ রকম একটা প্রস্তাব কী করে দিলে মরিয়ম?

আপনি অপরাধ নেবেন না সুলতান। আমি ও সব বুঝি না। বলছিলাম আপনার অসুখের কথা ভেবে। যুদ্ধ বিগ্রহ এত দিন চালিয়ে এলেন শিবাজীর সঙ্গে—কিন্তু তাতে লাভ কী হয়েছে আমি জানি না। আপনার মুখ থেকে শুনে মনে হয়েছে লাভবান হয়েছে ঐ শিবাজী। এ পর্যন্ত শিবাজী বিজাপুরের যতটা জমি দখল করেছে ততটা আর কারুর না।

আদিল শাহ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলল নিষ্করুণ কাঠিন্য। বলল: বিজাপুরের জমি যা নিয়েছে শিবাজী তার সবই এক দিন কেড়ে নেব মরিয়ম। আমার অসুখটা সারলে তুমি দেখবে, যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব আমি।

মরিয়ম গলার স্বর যথাসম্ভব নিচে রেখে বলল: তা আমি জানি সুলতান। আপনার শৌর্য এবং সাহসে আমার কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ যা জাগছে তা ঐ অসুখের জন্য। আর, কী জানেন সুলতান, মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের যে দুর্দমনীয় নেশা আওরঙ্গজেবকে পেয়ে বসেছে তাতে, বিজাপুরও তাঁর লোলুপ দৃষ্টি থেকে বেশি দিন রেহাই পাবে বলে মনে হয় না। শিবাজীকে দমন করতে পারলে আওরঙ্গজেবের থাবা এ দিকেও প্রসারিত হবে বলে আমার বিশ্বাস সুলতান!

আদিল শাহ চুপ করে থেকে কথাটা ভাবল। তারপর কাছে এসে মরিময়ের কাঁধে হাত রাখল। বিজাপুরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী মরিয়ম। সুলতানের তো আরও বেশি! তাই হয়তো এ সব আজগুবি ভাবনা ওকে বিচলিত করছে।

ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আদিল শাহ বলল: মোগল বাদশাহের দিক থেকে কোন ভয় নেই মরিয়ম। ভয় যা আছে ঐ দস্যুসর্দারের দিক থেকে।

মরিয়ম ডান হাত বাড়িয়ে আদিল শাহের বাঁ হাতখানা টেনে নিল নিজের হাতের মুঠোয়। আস্তে আস্তে চাপ দিতে দিতে বলল: আমি আর একটা কথা বলব সুলতান?

বল।—মরিয়মের গলা বেষ্টন করল আদিল শাহের দু'খানা হাত। পরম সোহাগে কাছে টানল ওকে। চোখে চোখ রেখে বলল: বল, কি ভাবছ?

আমি ভাবছি জাঁহাপনা, শিবাজীর সঙ্গে বিরোধ না বাড়িয়ে কোন রকমে মিটিয়ে ফেলা যায় না?

কি করে মিটবে বল মরিয়ম? ওর উদ্দেশ্যই হচ্ছে লুঠ-তরাজ করা। অপরের ঐশ্বর্যের উপর ওর ভীষণ লোভ। সে লোভের প্রবৃত্তিটাকে সংযত করতে না পারলে ওকে বিশ্বাস করা যায় না।

মরিয়ম ওর নিজের *দেহটাকে আদিল শাহের আলিঙ্গনে সম্পূর্ণ* ছেড়ে দিয়ে আবেশ-মদির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

শত্রুতা করলে শত্রুতা বেড়েই চলে জাঁহাপনা। আমার বক্তব্য হচ্ছে দুজনে যদি একটা হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বসে আলাপ আলোচনা করেন তাহলে হয়তো সমাধানের একটা সূত্র খুঁজে পাবেন। শিবাজী কী চায়, কেন সে অস্ত্র ধারণ করেছে, আর কতকগুলো গরীব মাওলা কেন ওর জীবন মরণের সহচর হয়ে আছে, তা জানতে চেষ্টা করেছেন কি কখনও?

এতে জানার কিছু নেই মরিয়ম। মাওলারা বড় অভাবী। শিবাজী অন্যরাজ্যের ধন সম্পদ লুঠ করে ওদের অংশ দিচ্ছে বলেই ওরা অনুগত হয়ে আছে।

তাহলে আপনার সৈন্যেরা অনুগত নয় কেন?

কী বলছ মরিয়ম! আমার সৈন্যরা আমার অনুগত নয় একথা কে বললে তোমাকে?

আবার আদিল শাহের হাতে আস্তে আস্তে চাপ দিতে লাগল মরিয়ম! উত্তর দিতে বলল ঃ কেউ আমাকে বলে নি জাঁহাপনা—কেউ বলে নি। এ আমার ভাবনা, আমার কথা। আপনার সৈন্যরা যদি বিজাপুরের একান্ত অনুগতই হবে, এত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হয়েও শিবাজীর সঙ্গে পেরে ওঠে না কেন? তারপর যখনই মুখোমুখি লড়াই হয়েছে তখনই আপনার বাহিনীর একটা বড় অংশ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে। আমার মনে হয় বিজাপুর প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।

আদিল শাহকে ভীষণ চিন্তিত দেখাল সে মুহূর্তে। একটু আগে যে উষ্ণ বেষ্টনীতে বুকে টেনে নিয়েছিল মরিয়মকে, যে উত্তেজনা,

পরিলক্ষিত হয়েছিল হাতের মুঠোয় চোখে মুখে, সব যেন মুহূর্তে উপে গেল।

বাহুবন্ধন অনেকটা শিথিল···মনের আবেগ যেন উধাও।

তোমার কথার মধ্যে অনেক সত্য আছে মরিয়ম, কিন্তু তুমি এত ভাবতে শিখলে কোথায় ? কখন চিন্তা করলে এত গভীরে গিয়ে ?

চিন্তা করেছি আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে। বিজাপুরের কথা ভেবে আমি অনুরোধ করব জাঁহাপনা লড়াই করবেন না। শান্তি স্থাপনা করুন। তাতে দেশের শান্তি ও মঙ্গল।

পলকের মধ্যে অন্য রূপ নিল আদিল শাহ। মরিয়মকে ছেড়ে দিল বাহুর বন্ধন থেকে। একহাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল। শাণিত দৃষ্টির ঝলক ফেলল মরিয়মের মুখে। এ কোন রহস্যময়ীকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে বিজাপুর সুলতান? এ কোন সুরে কথা বলছে ওর জলসামহলের বাঈজী ? শিবাজীর চর নয় তো ?

না, ঐ মুখের রেখায় রেখায় নীল দুটো চোখের তারায় কোন অবিশ্বাসিনীকে খুঁজে পেল না আদিল শাহ। ওর দৃষ্টিকোণ থেকে ও বিচার করেছে শিবাজীকে। ওর শান্তি-প্রত্যাশী মন যে-কোন কিছুর বিনিময়ে শান্তি কামনা করছে।

বিজাপুরের সুলতান তো আর মরিয়ম নয়। নারীর মন, নারীর চিন্তাধারা নিয়ে সে দুনিয়ায় আসে নি। এসেছে রাজা বাদশাহের মন নিয়ে।

কি ভাবছেন জাঁহাপনা ?

আবার অভিসারিণীর ভঙ্গিতে কাছে এল মরিয়ম।

ভাবছি তোমার পরামর্শ। কিন্তু মরিয়ম, তোমার অনুরোধ রাখতে গেলে আমার ধর্ম জাহান্নমে যাবে! শিবাজী যুদ্ধ করছে হিন্দুরাজ্যের জন্য। তাকে স্বীকার করে নেওয়া মানে আমার নিজের ধর্মকে কবরে পাঠানো।

জাঁহাপনা!

অতি মোলায়েম কণ্ঠে কি যেন বলতে যাচ্ছিল মরিয়ম কিন্তু তার আগেই বান্দা মহম্মদের গলা ভেসে এল।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বললেঃ একজন দস্যু ধরা পড়েছে জাঁহাপনা। তাকে কী করা হবে, অর্থাৎ কী শাস্তি দেওয়া হবে জানতে চাইছে নজরদার?

আদিল শাহ ত্রস্ত পায়ে বাইরে এল। জলসাঘরের আলো নিভে গেল একে একে। মরিয়ম সন্তর্পণে অনুসরণ করল সুলতানকে।

আত্মগোপন করে দেখা করতে এসেছিল শান্তারাও, জানতে এসেছিল কি অবস্থায় আছে বীরা। দীর্ঘকাল দেখা সাক্ষাৎ নেই, পায় নি কোন খোঁজ খবর।

খোঁজ খবর পাবে কি করে? দু জন দুই সীমানার মধ্যে বন্দী।

শিবাজী আগ্রার দুর্গ থেকে পালিয়ে এসে দুর্জয় সংকল্প নিয়ে অস্ত্রধারণ করেছে। দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করেছে মোগলের বিরুদ্ধে।

একটির পর একটি দুর্গ জয় করে চলেছে শিবাজী। যে সব দুর্গ সন্ধির সর্ত অনুসারে মোগল সম্রাটকে ছেড়ে দিয়েছিল, সে সব দুর্গ পুনরধিকার করে নিতে এক মাসের বেশি সময় লাগল না। বিশাল গড় দুর্গ জয় করল মাত্র দুই দিনে। মাল্কাপুর গিরিপথ দখল করে নিল তৃতীয় দিনে, চতুর্থ দিনে সিংহগড় দুর্গ।

সিংহগড় দুর্গ জয় করার পর হঠাৎ শান্তারাওয়ের মনে পড়ল বীরাবাঈয়ের কথা। কত দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। প্রথম শিবাজীর বাহিনীতে যখন নিজের নাম যুক্ত করে তখন মনে হয়েছিল দেশ উদ্ধারের কাছে, একটা জাতির স্বাধীনতার কাছে একটি নারীর প্রেম কিছুই নয়। যুদ্ধের দামামায়, দেশ জয়ের উত্তেজনায় হারিয়ে যাবে

বীরাবাঈ। হারিয়ে যাবে স্মৃতির সামনে থেকে বীরার শান্ত নীলাভ দুটো চোখের তারা।

কিন্তু মাল্কাপুরের গিরিপথে পাহাড়নুড়িতে হোঁচট খেয়ে নতুন করে মনে পড়ল বীরার মুখখানা। বিজাপুরের সুলতানের আশ্রয়ে কেমন আছে কে জানে।

আচ্ছা, ঐ গিরিপথ দিয়ে সাধারণ চাষীর বেশে কি একবার যাওয়া যায় না? তা হয়তো যায়।

আদিল শাহের সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে সুলতানের অট্টালিকার কাছাকাছি হয় তো যাওয়া যায়। কিন্তু তারপর? কী করে যোগাযোগ করবে বীরাবাঈয়ের সঙ্গে? কী করে খবর পাঠাবে ওকে? কোন ঘরে, কোন মহলে ওর আস্তানা তার সঠিক সন্ধান কে দেবে?

সে সময় আর একখানা মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। সে মুখ কৃষ্ণাজীর। সে লোকটি শিবাজীর প্রতি আস্থাশীল! তার সহানুভূতি আছে মাওলা সৈন্যদের পক্ষে।

সেখানে গিয়ে যদি কোন রকমে তাকে খুঁজে বের করা যায়, তাহলে হয়তো বীরাবাঈয়ের দর্শন লাভের একটা সুব্যবস্থা হতে পারে।

বিবেকবান ব্রাহ্মণের নিশ্চয় সমর্থন লাভ করা যাবে। বহুদিন প্রিয়ার অদর্শন বেদনায় জর্জরিত হৃদয় শান্তারাওয়ের স্বপক্ষে। আর দেরী করে নি শান্তারাও। সেদিনই বেরিয়ে পড়েছিল।

খুঁজে খুঁজে দেখা করেছে কৃষ্ণাজীর সঙ্গে। তার কাছে নিবেদন করেছে বিজাপুর আগমনের হেতু। কৃষ্ণাজী নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সুলতানের প্রাসাদে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বীরাবাঈ প্রথমটা যেন চিনতে পারল না। শুধু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল অপলক।

চোখের সামনে কাঁপতে থাকল একখানা কুয়াশার পর্দা। সে পর্দা সরিয়ে দিতে এগিয়ে গেল শান্তারাও নিজে।

আমি শান্তারাও বীরা।

চেনা অচেনার ধোঁয়ার কুণ্ডলী আগন্তুকের একটি কথার ফুৎকারে উড়ে গেল। স্পষ্ট হয়ে উঠল হাসির দীপ্তি। অস্ফুট উচ্চারণে বলল : তুমি !

হ্যাঁ, আমি বীরা। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি !

আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ ? কিন্তু তুমি সুলতানের বেগম মহল পার হয়ে এখানে কি করে এলে ?

তোমার আকর্ষণের জোরে। শান্তারাওয়ের গলার স্বরে আবেগ।

খুশী হলাম শান্তারাও। আমাকে আজও মনে রেখেছ জেনে আনন্দিত হলাম। কিন্তু যুদ্ধ করে করে চেহারার কী ছিরি হয়েছে !

বলতে বলতে কেঁদে ফেলল বীরা। দু চোখের প্রান্ত বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর ধারা।

ভুলে যাব এ কথা ভাবতে পারলে কি করে ?

বীরাবাঈ এগিয়ে এসে হাত ধরল শান্তারাওয়ের। ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। তুমি যে লোকটার দলে ভিড়েছিলে—সে লোকটা তো শুনেছি একটি অমানুষ। প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, দয়া, মায়া ইত্যাদি মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলির নাকি কোন মূল্যই নেই ওর কাছে।

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল শান্তারাও। বলল : তুমি ভুল শুনেছ বীরা। মানুষের প্রতি ভালবাসার মূল্য আজকের হিন্দুস্থানে কেউ যদি দিতে জানে তো ঐ শিবাজী।

শান্তারাওয়ের বিশ্বাস মেনে নিতে পারল না বীরাবাঈ। এক মত হতে পারল না। বলল : তুমি বড় সরল, বড় সহজ মানুষ শান্তারাও। তাই ও লোকটাকে চিনতে পার নি ? তুমিই বল, কোনো জীবদরদী মানুষ কি পারে দিনের পর দিন মাসের পর মাস যুদ্ধ করে অসংখ্য অগুন্তি মানুষকে হত্যা করতে ?

কতকগুলো অমানুষের হয়ে এত লোক লড়াই করতে যাচ্ছে কেন বীরা ?

লড়াই না করলে তারা খাবে কি—ওই তো তাদের জীবিকা। জান, তোমাদের নেতার নির্দেশে যাদের তোমরা হত্যা করছ, তাদের ঘরে আরো কত জনের মৃত্যু পরোয়ানা তোমরা জারী করে রাখছ ? সে খোঁজ নিয়েছ কোন দিন।

এখানেই আমাদের সঙ্গে অত্যাচারী রাজা বাদশাহ আর তাদের আমির ওমরাহদের তফাত। শিবাজীর শাসিত এলাকায় কোন লোক মরে গেলে তার স্ত্রী পুত্র পরিজনের দায়িত্ব আমরাই গ্রহণ করি। আমরা মানে শাসক শ্রেণী। সে জন্যে আমাদের সৈন্যরা মরতে ভয় পায় না। শত্রুপক্ষে যোগ দেয় না। বিশ্বাসঘাতকতা করে না কেউ।

ভালো ভালো কথা শোনাতে আর শুনতে খুব ভালো লাগে শান্তারাও।

বীরাবাঈয়ের কণ্ঠ যেন বিদ্রূপ করে উঠল।

মহারাষ্ট্রবাসীকে সুখী করার আন্তরিক প্রচেষ্টা যে শিবাজী চালিয়ে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই বীরা। যদি কোন দিন সুযোগ হয় তখন দেখবে সেখানকার মানুষগুলো কত সুখে আছে।

সত্যি বলছ শান্তারাও ? সত্যি সত্যি কি জাবেলীর গরীব-দুঃখী মানুষগুলো সুখে আছে ?

এক তিলও বাড়িয়ে বলছি না বীরা। এক দিন নিজের চোখে দেখবে, তখন প্রমাণিত হবে আমার কথার সত্যতা।

বীরাবাঈয়ের দুটো চোখ খুশিতে চিকচিক করে উঠল। এগিয়ে এসে শান্তারাওয়ের হাত ধরে আবদারের সুরে বলল : আমাকে তুমি সেখানে নিয়ে চল শান্তারাও। এ পাপপুরীতে আর এক মূহূর্ত আমার থাকতে ইচ্ছে করে না। এখানে মানুষ নেই শান্তারাও।

বীরাবাঈয়ের কথা শুনতে শুনতে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল

শান্তারাও। দুটো চোখ যেন ওর জ্বলে উঠল : তোমার প্রতি কি কোন অসম্মান দেখিয়েছে আদিল শাহ ?

বেশি দিন যদি এই নরককুণ্ডে বাস করি চন্দ্ররাও-কন্যার কুমারীত্ব বলে কিছু থাকবে না। শান্তারাও তুমি আমাকে বাঁচাও।

শান্তারাওয়ের বুকের কাছে মুখ নিয়ে গেল বীরা। ওর বিস্তৃত বক্ষদেশে চেপে ধরল । শান্তারাওয়ের কোর্তা আস্তে আস্তে ভিজে যেতে লাগল।

এমন সময়ে দু জনকেই সচকিত করে কে যেন প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল : কে ?

দ্রুত সরে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল বীরা। শান্তারাওকে আড়াল করতে চাইল।

কিন্তু ততক্ষণে ওদের কাছাকাছি এসে গেছে প্রশ্নকর্তা।

কে এখানে দাঁড়িয়ে ?

আমি।

আমি মানে সুলতানের মেহমান বীরাবাঈ ?

হ্যাঁ মহম্মদ···পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মহম্মদের সামনে দাঁড়াল বীরা : আমি বীরাবাঈ।

আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন ?

এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল মহম্মদ।

কারও সঙ্গে নয় মহম্মদ। নিজের মনে কথা বলছিলাম বোধ হয়।

সে আবার কি রকম ?

বোধ হয় গান গাইছিলাম।

না বাঈসাহেবা। কে একজন এসেছে। আমি কিন্তু গলা শুনতে পেয়েছি। পুরুষ গলা।

না, না,—তুমি ভুল শুনেছ।

বাঈসাহেবা, আমি জেনানা মহলের প্রধান বান্দা। আমার

কাছে লুকোলে কি ভালো হবে! সত্যি করে বলুন কে এসেছে আপনার কাছে?

মহম্মদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল বীরাবাঈ। আধো অন্ধকারে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল: তোমাকে বলব মহম্মদ, তোমাকেই বলব। কিন্তু তুমি তাকে ধরিয়ে দেবে না তো?

এক গাল হাসল মহম্মদ। দুটো চোখের তারা ওর চিক্‌চিক্ করে উঠল কৌতুকে। বীরার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল: মহব্বতের মরদ বুঝি?

বীরাবাঈও হাসল। সলজ্জ হাসির টোল পড়ল ওর গালে। বেগম মহলের জানালার নীল শার্সির ফাঁক দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছে, ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছে তার কাছেই। সে আলোতে দুজনে দু জনের মুখে তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ। একজন খোজা বান্দা আর একজন দয়িতের সান্নিধ্য লাভের জন্য উতলপ্রাণ নারী।

কৈশোর জীবনের এক বৈশাখী সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ওর পরিচয় মহম্মদ। সে পরিচয় এতদিনে পরিণয়ে পৌঁছত যদি না ও লড়াইয়ে যোগ দিত।

অপ্রচুর আলোর অস্পষ্টতায় বীরাবাঈ দেখল মহম্মদের মুখের রেখাগুলো মুহূর্তের মধ্যে ইস্পাত দৃঢ় হল। দুটো চোখের তারা যেন চঞ্চল হল। গলার স্বর অপেক্ষাকৃত উঁচুতে তুলে বলল: আপনার মহব্বতের আদমী তাহলে কি আমাদের দুশমন?

মহম্মদ!

বীরাবাঈ মহম্মদের মুখে হাত চাপা দিতে গেল। এক ঝাপটায় ওর হাত সরিয়ে দিল বান্দা। উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল: বড় কসুর করেছেন বাঈসাহেবা, বড় ভুল করেছেন। বিজাপুরের আশ্রয়ে থেকে বিজাপুর সুলতানের জেনানা মহলে ডেকে এনেছেন আমাদেরই শত্রুকে!...

দ্রুত পায়ে মহম্মদ এগিয়ে গেল নজরান মহলের দিকে। পেছন

থেকে ওকে নিরস্ত করতে চাইল বীরাবাঈ। পেছন পেছন ছুটে গিয়ে ওকে হাত ধরে ফিরিয়ে আনতে চাইল।

কিন্তু একগুঁয়ে স্বভাব মহম্মদ হাত ছাড়িয়ে নিল।

সুলতানের নিমক খাই বাঈসাহেবা। বেইমানী করতে পারব না।

আমার দিকে তাকিয়ে আমার মহব্বতের মানুষটাকে বাঁচাও মহম্মদ।

বীরাবাঈয়ের আকুল স্বর সামনের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। মহম্মদের মরমে পৌঁছল না।

বীরাবাঈ আবার ডাকল ঃ মহম্মদ…

কোন সাড়া এল না। বরং নজরদার মহলে একটা সোর গোল উঠল। সেখানে যেন একটা ব্যস্ততা, একটা যেন সাজ সাজ রব।

বিপদের সংকেত পেয়ে দ্রুত পায়ে শাস্তারাওয়ের কাছে এল বীরা। ওর পিঠে হাত রেখে শাস্তারাওয়ের কাঁধ কামড়ে বীরাবাঈ বলল, কী হবে শাস্তারাও।

শাস্তারাও অনুভব করল নারীর সমস্ত হৃদয়ের আকুল আলিঙ্গন।

শাস্তারাওকে জড়িয়ে গুপ্ত পথের দিকে পা বাড়াল বীরাবাঈ।

শাস্তারাও বলল ঃ কাপুরুষের মত পালিয়ে আমি বাঁচব ! এদিকে তোমার কি হবে ভেবে দেখেছ ?

আমার যা হবে তার মকাবিলা আমি করব শাস্ত। তুমি এখন জেনানা মহলের বাইরে যাও…যা—ও…

তা হয় না বীরা। তোমাকে শত্রুর লালসার আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে আমার যাওয়া হয় না।

গুপ্তপথের মাঝামাঝি এসে ঘুরে দাঁড়াল শাস্তারাও। বীরাবাঈয়ের হাত ধরে ওর গতি রোধ করল।

দাঁড়িও না শাস্ত। এস লক্ষ্মীটি। এগিয়ে এস। আর খানিকটা যেতে পারলে বাগানে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে গা ঢাকা দিলে আর তোমাকে পায় কে।

তুমি আমার সঙ্গে এখন যাবে তো ?

আমাকে নিয়ে তুমি পালাতে পারবে না। তাহলে দু জনেই ধরা পড়ে যাব। তার চেয়ে তুমি পালাও। বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে এখানে এলে তোমার গলায় জয়মাল্য পরাবার জন্য আমি থাকব। আমি নিশ্চয় বেঁচে থাকব শান্ত·· এখন তুমি যাও।

গুপ্তপথ শেষ হতেই বীরার কানে এল একটা সোর গোল। বাগানের পরিধিতে প্রচণ্ড হৈ চৈ।

এগোলে বিপদ···পেছলেও তাই। দু'দিকেই সশস্ত্র প্রহরী উদ্যত।

এগিয়েই গেল বীরাবাঈ। পেছনে শান্তারাও। বাগানের মাটিতে পা দিতেই বল্লম নিয়ে এগিয়ে এল এক দল নজরদার।

হাত তুলে বারণ করল বীরাবাঈ—আমি তোমাদের মেহমান নজরদার। আর এই পুরুষটি আমার মেহমান! ওকে হত্যা করা কি তোমাদের উচিত হবে ?

কে শোনে বারণ! কে কান দেয় বীরাবাঈয়ের ক্ষীণ কণ্ঠনিসৃত ঐ আবেদনে ? দু' জন নজরদার এগিয়ে এসে শান্তারাওয়ের হাত ধরল। অন্য জন বল্লম উঁচিয়ে রাখল। এমন একটা ভাব বাধা দিলেই খুন।

এমন সময় একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে গেল। কোথা থেকে খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে এল মরিয়ম। ওড়নার আচ্ছাদন মুখের উপর থেকে সরিয়ে সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ডান হাত তুলে বিরত করল বল্লমওয়ালা নজরদারকে।

বাঈজী সাহেবা!

নজরদাররা স্তম্ভিত হয়ে গেল। হাত তুলে কুর্নিশ করল। সঙ্গে সঙ্গে বান্দা মহম্মদও।

কাকে তোমরা ধরেছ মহম্মদ ?

আমাদের শত্রু বাঈজী সাহেবা। দস্যু সহচর।

কোথায় সন্ধান পেলে তার ?

বীরাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য জেনানা মহলে ঢুকেছিল বাঈজী সাহেবা।

বীরাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ?

মরিয়মের কণ্ঠে এবং দৃষ্টিতে সমান বিস্ময়।

হ্যাঁ বাঈজী সাহেবা। আমার কাছেই গিয়েছিল শাস্তারাও। আমার জীবন মরণের একমাত্র সঙ্গী ও। ওকে তুমি বাঁচাও বাঈজী সাহেবা। ভগবানের কাছে অনেক আশীর্বাদ পাবে তুমি।

মরিয়মের হাত ধরে কেঁদে ফেলল বীরাবাঈ।

নজরদারদের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে এনে মহম্মদকে লক্ষ্য করে বলল: ওকে তোমরা ছেড়ে দাও মহম্মদ। ও তোমাদের শত্রু হয়ে বিজাপুর অট্টালিকায় ঢোকে নি। ঢুকেছে প্রেমিক হয়ে! শাস্তারাও সুলতানের প্রাসাদ দখল করতে আসে নি। এসেছে মহব্বতের কাঙাল হয়ে। কাজেই মহব্বতের মানুষকে ধরে রাখতে নেই।

কিন্তু সুলতানের কাছে কি জবাব দেব বাঈজী সাহেবা ?

সে জবাব আমি দেব মহম্মদ ?

মরিয়মের তেজোঃদৃপ্ত কণ্ঠ সকলকে সচকিত করল। ওর রূপের দিকে তাকিয়ে নজরদারদের হাতের মুঠো শিথিল হল। ছেড়ে দিল শাস্তারাওয়ের হাত। বল্লমওয়ালা বল্লম নামাল।

নজরদাররা একে একে সরে গেল। সরে গেল বান্দা মহম্মদ। খানিকটা দূরত্বে গিয়ে আপন মনে বলল: একটা চিড়িয়া ধরে-ও কোতল করতে পারলাম না…বেতমিজ…

বাগান পার হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে জলসামহলের বিপরীত দিকের জলাশয়ের ধারে গেল মরিয়ম। শিসমহলের জানালার রঙীন শার্সির ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে জলাশয়ের

ঢেউ-এ। জলের উপর থরোথরো কাঁপছে আলোর রেখা। চিকচিক করছে। দেবদারু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে এখানে সেখানে। সে আলোয় জল মসীকৃষ্ণ দেখাচ্ছে। তীরে বসল মরিয়ম।

কেন কে জানে আজকের এ সন্ধ্যায় ওর মনটা বড় বেশী ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে। একটা উদাস ভাব যেন ওর চেতনাকে ঘিরে রয়েছে।

কিন্তু কেন?

এ কি মহব্বতের বাসনা? যে মহব্বতের দুর্নিবার আকর্ষণ মানুষের মন থেকে মৃত্যু ভয়ের চিহ্নলেশ পর্যন্ত মুছে ফেলে, সে মহব্বতের এক নতুন উপলব্ধি ওর মনকে কি নাড়া দিয়ে গেছে?

ছোট বড় কত পুরুষের মহব্বতই তো কুড়িয়ে এসেছে এত কাল। আদিল শাহ, রণদুল্লা খাঁ তো আজো ওর এতটুকু করুণা দৃষ্টির জন্য উন্মাদ। নাচের আসরে কত সেরা সেরা আমীর ওমরাহকে চোখের ইশারায় ঘায়েল করেছে মরিয়ম।

হ্যাঁ, ঘায়েল করেছে অনেককে। কিন্তু নিজে ঘায়েল হয় নি। মাঝে মধ্যে মন যে দুর্বল হয় নি তা নয়। হয়েছে। কিন্তু বিবেকের শাসন সে দুর্বলতার বিষবাষ্পকে ঝড়ের বেগে তাড়া করেছে।

মনের সামনে রাজপথের লাল আলোর সংকেতের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছে মতিবাঈয়ের সেই মূল্যবান উপদেশ। দেহ পেলেই বিত্তবান মানুষদের সব পাওয়া হয়ে গেল। তখন আবার নতুনের সন্ধানে ছুটবে। এই হচ্ছে বড় লোকের প্রেম। রাজা-বাদশাহের মহব্বত। কাজেই খুব সাবধান মরিয়ম।

সেই সাবধানতা অবলম্বন করেই তো বছরের পর বছর কাটিয়ে এল মরিয়ম।

কিন্তু কেন? কিসের মোহে উপেক্ষা করে এসেছে আদিল শাহের মহব্বতকে?

আদিল শাহ মহব্বতের কথা শুনিয়ে ওর দেহ ভোগ করত।

এক দিন দু দিন—যতদিন দেহে রূপ যৌবন আছে ততদিন। তারপর? তার পর নিশ্চয় ছুঁড়ে ফেলে দিত পথের ধারে। সে দিনটির জ্বালার কথা স্মরণ করে পহেলি মাইকেলেই রক্ষা কবচ হাতে নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নিজেকে বাঁচিয়েছে মরিয়ম।

কিন্তু বিবেক কি অন্য দিক থেকেও সজোরে ধাক্কা দিয়ে যায় নি অবচেতন মনকে?

দেহের শুচিতা রক্ষার নামে এতকাল কি আত্মপ্রবঞ্চনার অন্ধকার পথ ধরে জীবনের দিনগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যায় নি?

কী হবে এই যৌবন বাঁচিয়ে রেখে আর দেহের চারিদিকে প্রাচীরের আড়াল তুলে।

আদিল শাহ বলেছিলঃ তোমাকে আমি সব দেব মরিয়ম। ধন দৌলত মণি মুক্তো তুমি যা চাও।

আমি ও সবের কিছুই চাই না জাঁহাপনা।

তবে কি চাও তুমি মরিয়ম?

রূপোর পাত্রে সরাব ঢেলে মরিয়ম এগিয়ে দিয়েছে আদিল-শাহের হাতে।

সরবতের মত এক চুমুকে খেয়ে নিয়েছিল আদিল শাহ। আর এক গ্লাস দাও মরিয়ম। আর এক গ্লাস দাও।

আর ও এক গ্লাস সরাব দিয়েছিল মরিয়ম। ততক্ষণে নেশায় পেয়েছিল আদিল শাহকে। তবু থেমে থেমে টেনে টেনে বলেছিলঃ তুমি কী চাও মরিয়ম?

আমি বেগম হতে চাই জাঁহাপনা! পারবেন জলসামহলের এই বাঈজীকে বেগমের মর্যাদা দিতে?

নেশায় টলতে শুরু করেছিল আদিলশাহ। কথা আটকে যাচ্ছিল, জিভে ভীষণ জড়তা। বলেছিলঃ তুমিই হবে আমার বেগম মরিয়ম। আমার বাহিনী যখন পুণা পর্যন্ত অধিকার করবে, আমি যখন দাক্ষিণাত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাদশা হব তখন তুমিই হবে আমার বেগম।

অবাক হয়েছিল মরিয়ম কথাটা শুনে। জলসামহলের একজন সাধারণ বাঈজীকে বিজাপুরের সুলতান তার বেগম করবে। লক্ষ্ণৌর মতিবাঈয়ের ঘর থেকে কিনে আনা অজ্ঞাত কুলশীল এক নারীকে দেবে বেগমের মর্যাদা? তার পর মুহূর্তে বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেছে। ওর মনের আকাশ হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ। তাই তো হয়। রাজা বাদশাহরা বেহেস্তের হুরীদের এনেই তো রাণী বেগম করে না। কিম্বা বাঁদী বাজার থেকে কিনে আনা রূপসীকেও দেয় বেগমের সম্মান। ওকেও দিতে পারে।

তবু আদিল শাহের আলিঙ্গনে ধরা দেয় নি মরিয়ম। দেয় নি এই কারণে যে ওর মনে হয়েছে, হাজারো বেগমের একজন হয়ে হারেমে ঢুকতে ও তুনিয়ায় আসেনি। ওর যা রূপ, যা গুণ তাতে এক এবং অদ্বিতীয় হয়েই কোন সুলতান বা নবাবের হারেমে থাকতে পারে।

তারপর সুলতান এখন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। সুরার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে দিন রাত। তাই মুখে যা আসছে তাই বলছে।

মনে পড়ে গেল চন্দ্রালোকস্নাত আর একটি মধুর সন্ধ্যার স্মৃতি।

সেদিন ছিল শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। আকাশে ছিল রূপোর থালার মত মস্ত বড় চাঁদ। জলসামহলের ঝাড়লণ্ঠনগুলো নিভে গিয়েছিল একে একে।

আদিলশাহ কাছে এসে বসেছিল ওর। কোথায় যেন একটা ভয় লুকানো সুলতানের। একটা যেন তুর্বলতা। সে জন্যেই সীমাহীন নেশা করেও মরিময়কে বুকে টানবার জন্যে মরিয়া হয়ে হাত বাড়ায় নি।

সে দিন চাঁদের আলোর একটা ফালি এসে লুটোপুটি খাচ্ছিল জলসাঘরের কাশ্মিরী জাজিমে। সে আলোয় মরিয়মের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল আদিল শাহ। ওর হাতখানা টেনে নিয়েছিল নিজের হাতের মুঠোয়। চাঁপার কলির মত আঙুল-গুলো টিপে দিচ্ছিল। এক সময় বলেছিল: মরিয়ম!

জাঁহাপনা!

এত রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এলে অথচ সে রূপের কোন সদ্ব্যবহারই করলে না?

আদিল শাহ ওর আঙুলগুলি ছেড়ে দিয়ে বলিষ্ঠ হাত বাড়িয়ে ওর দেহখানাকে টেনে আনতে চেয়েছিল নিজের বুকের মধ্যে।

জাঁহাপনা আমি আপনার আশ্রিতা।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ···চকিতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল আদিল শাহ: কিন্তু কি জান মরিয়ম—আমার খুব কষ্ট হয়। তোমার এত রূপ, অথচ কেউ তোমার রূপের আস্বাদ পেল না। না পুরুষ, না, শিল্পী।

সত্যি বলছেন জাঁহাপনা? সত্যি কি আমি রূপসী? না আমাকে খুশী করবার জন্য বলছেন?

আদিল শা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল: একটুও বানিয়ে বলছি না মরিয়ম, একটি শব্দও বাড়িয়ে বলছি না। তুমি নুরজাহানের চেয়েও সুন্দরী।

নিজেকে যেন সামলাতে পারছিল না মরিয়ম। ইচ্ছে করছিল তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ে আদিল শাহের পেশীবহুল বুকে।

কিন্তু পারে নি। মতিবাঈয়ের মুখখানা ভেসে এসেছিল ওর মানসপটে। কানের কাছে বেজেছিল ওর কথাগুলো—ওর সেই সতর্কবাণী!

আদিল শার চোখে তখনও স্বপ্নের ঘোর। আবেশে যেন জড়িয়ে আসতে চাইছিল দুটো চোখের পাতা।

সে দিকে তাকিয়ে মরিয়ম বলেছিল: আমাকে আপনি যা মর্জি বলুন জাঁহাপনা। কিন্তু নুরজাহানের সঙ্গে তুলনা করে তার রূপের অমর্যাদা করবেন না!

জাঁহাপনা সত্যি কথা বলছে। তোমাকে দেখলে সাজাহান মমতাজকে কিছুতেই বেগম করত না।

সেদিন একটা উষ্ণ রক্তের স্রোত যেন শিরদাঁড়া বেয়ে শনশন

আওয়াজ তুলে উঠে গিয়েছিল উপর দিকে। সারা দেহ শির শির করে উঠেছিল। মনে হয়েছিল নিজেকে মেলে ধরবে আদিল শাহের কাছে।

সে মুহূর্তে কে যেন ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে ও শিল্পী। সঙ্গীত সাধিকা। সঙ্গীত আর নৃত্যই ওর জীবন। ও তো বারবনিতা নয়। বাঈজী মহলের রতিবাঈদের মত দেহসর্বস্ব ও হতে পারবে না। দেহ এবং যৌবনের জ্বালা জয় করতে না পারলে শিল্প সাধনা ওর সার্থক হয়ে উঠবে না। দেহোপজীবিনীদের গলার স্বর যে কখনই মিঠে থাকে না। ভেঙে বিশ্রী হয়ে যায়। বেগমদের গলার স্বরও কি ভাঙা? কে জানে।

তীব্র জ্বালাময় অস্থিরতা থেমে গিয়েছিল মরিয়মের মনে। ঘরের মধ্যে হাহাকার তুলেছিল পূর্বী রাগিনীর সুর। উদাস উদ্দাম ঝড়ের মত। বেহেস্তের মত কটা দরজা বুঝি খুলে গিয়েছিল ওর মনের সামনে।

ক্রমশ রাত বেড়েছিল। সুলতান চলে গিয়েছিল বেগম-মহলে। মরিয়মের দেহ এবং মনের ঝড় থেমে গিয়েছিল আস্তে আস্তে।

আজ যেন সে ঝড় অন্য রূপ নিয়ে মাতাল হয়েছে ওর মনের রাজ্যে। পিছনে বাগানের সীমানায় অন্ধকার জমাট বাঁধছে। মৃদু বাতাস সে দিক থেকে বয়ে নিয়ে আসছে বসরাই গোলাপের গন্ধ।

একটি প্রশ্ন মনকে বারংবার পীড়া দিয়ে যাচ্ছে। এতদিন সুর-সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে কোথায় চলেছিল মরিয়ম? কৈ, দীর্ঘ দশ বছরের যাত্রার পরও তো কিনারা ভেসে উঠল না।

আজ যেন মহব্বতের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে মরিয়ম। নতুন কামনা মাথা তুলেছে মনের মাটিতে। সসাগরা ধরিত্রীর মালিকের বেগম নয়, বাঈজী নয়, বারাঙ্গনা নয়—বীরাবাঈ-এর কামনা।

জলাশয়ের দিকে তাকাল মরিয়ম। নীল আলোয় ভাসছে জলাশয়ের জল। নীলাভ জলের উপরে ছোট ছোট তরঙ্গ ঝিকমিক করছে।

সকালের দিকে খবরটা শুনে আদিল শাহের মন খারাপ হয়ে গেল। শিবাজীর সঙ্গে মোগলদের বিবাদ চরম রূপ নিয়েছে। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ সমানে চলেছে। আর কী শয়তান দিল্লীর বাদশাহ। শিবাজীর হাতে মার খেয়ে শোধ নিচ্ছে বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার উপর।

এই শিবাজীকেই একদিন মারাঠা মূষিক বলে বিদ্রূপ করেছিল আওরঙ্গজেব। এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে বলে আশা করেছিল। এখন সেই শিবাজী দিল্লীর ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একদিকে হাত গুটোচ্ছে, অন্যদিকে হাত বাড়াচ্ছে। শিবাজীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে পিছু হটছে আর অন্যদিকে বিজাপুরকে গ্রাস করছে।

নানা ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে মন এমনিতেই খারাপ যাচ্ছিল আদিল শাহের। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

এমন সময় আর একটি দুঃসংবাদ শুনে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

শান্তারাওকে ছেড়ে দিয়েছে মরিয়ম।

আদিল শার শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী শিবাজীর অন্যতম প্রধান অনুচর। কল্যাণ জেলা রক্ষা করার জন্য যখন বিজাপুর সৈন্যরা মরণপণ লড়াই করেছিল, শিবাজীর মাওলা সৈন্যরা যখন পরাজিত হয়ে পালাতে চেয়েছিল তখন সেই হতোদ্যম সৈন্যদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল ঐ শান্তারাও। মাত্র সাত শত সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রায় সাত হাজার বিজাপুরী সৈন্যের বিরুদ্ধে।

কী অসাধারণ রণনৈপুণ্যই না দেখিয়েছিল শান্তারাও। কী দুঃসাহসিক অভিযানেই না বেরিয়েছিল সেদিন কল্যাণ জেলার পাহাড়ের সানুদেশে?

আশ্চর্য! মাত্র কয়েকঘণ্টা যুদ্ধ করেই জয় করে নিয়েছিল কল্যাণ।

সে রকম একটা লোককে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে আদিল শাহের নজরদাররা। সামান্য একজন বাঈজীর হুকুমে ওরা শত্রুকে মুক্তি দিল!

মরিয়মও বড় বেশি প্রশ্রয় পেয়ে গেছে। নিজেকে বেশি জাহির করতে শুরু করেছে। যে কাজ করতে প্রধান বেগম শংকিত হয়ে উঠত, সে-কাজ অক্লেশে করে যাচ্ছে মরিয়ম? এত বড় দায়িত্ব সে নেয় কোন সাহসে?

না—আর নয়। এবার সতর্ক করে দেওয়ার সময় এসেছে। কোন দিন শিবাজীর গুপ্তচর এসে ঢুকে পড়বে সুলতান প্রাসাদে এদেরই নির্বুদ্ধিতার জন্যে। সমস্ত তথ্য পাচার করবে ও-পারে!

কিন্তু কখন যাবে জলসামহলে? এদিকে যে খবরের পর খবর আসছে। একের পর এক দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে আসছে বিজাপুর সুলতানের সওয়ানি-নিগার—তিন দিনের মধ্যে সুসংবাদ বলতে এনেছে একটি। তানাজী নিহত হয়েছে মাল্কাপুরের যুদ্ধে। শিবাজীর শ্রদ্ধা-ভাজন সেনানায়ক প্রাণ হারিয়েছে বিজাপুর বাহিনীর হাতে।

তাহলেও কি রক্ষা করতে পেরেছে সে গিরিপথ। তানাজী জীবন দিয়েও বিজাপুরের সিংহদ্বার মুক্ত করে দিয়ে গেছে মাওলা সৈন্যদের কাছে। ওরা এখন স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়তে পারে। সহজে এগিয়ে আসতে পারে বিশাল গড়ের দিকে।

অপর দিকে কি ঘটছে কে জানে? গোলকুণ্ডা জয় করে বিজাপুরের সীমানায় প্রবেশের মুখে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে শাহজী। সঙ্গে কৃষ্ণাজীও রয়েছে। তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে নি আদিল শা। তাই সঙ্গে দিয়েছে সওকত খাঁকে।

খবর সকাল বেলা পর্যন্ত শুভই :ছিল। শিবাজীর বাহিনী তিন তিনবার পরাজিত হয়ে পিছু হটেছে শাহজীর রণনৈপুণ্যের কাছে। পুত্রের চেয়ে পিতাও কম যায় না যুদ্ধ বিগ্রহে।

আশ্চর্য! এই সৎ এবং সাহসী মানুষটাকে বন্দী করেছিল আদিল শা। বন্দী করেছিল আমীর ওমরাহদের কুপরামর্শে। কিন্তু পুত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে শাহজী অস্ত্রধারণ করবে এই স্পর্ধিত প্রতিশ্রুতি যে দিন সগর্বে উচ্চারণ করেছিল শাহজী সেদিন তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল আদিল শা। মুক্ত করে দিয়েও সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল শাহজীর গতিবিধির উপর।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষ শাহজী। অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজের কর্তব্য পালন করে গেছে। কোথাও এতটুকু কোন গলদ রাখে নি। কোথাও কোন ফাঁক রাখে নি কাজে।

এবার শেষ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে সে। রণক্ষেত্রে কর্তব্য-পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে আন্তরিকতার কোন অভাব নেই তার দিক থেকে। শেষ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হবে, বিজাপুর সুলতানের প্রতি তার আনুগত্য প্রমাণ করে যাবে নিজের জীবন দিয়ে। অথবা মাওলা সৈন্যের হাতে বন্দী হয়ে। কিন্তু বিজাপুর রক্ষা পাবে তো?

যতদূর জানা গেছে শিবাজী অন্যদিকে ব্যস্ত। মন মেজাজ নাকি ভালো নেই। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভাজি মোগলদের যুদ্ধে হেরে গিয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল।

এ খবর শুনে শিবাজী ভীষণ ক্ষুব্ধ। মোগলের নতি স্বীকার তার কাছে অসহনীয়।

দিলীর খাঁ সেদিক থেকে উদার। সে ইচ্ছে করলে শম্ভাজীকে বন্দী করে আগ্রা পাঠিয়ে দিতে পারত। পারত ইচ্ছে মত শাস্তি দিতে। সে কিন্তু তা করে নি। বরং রক্ষী বাহিনী দিয়ে শিবাজী-অধিকৃত এলাকায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

সেই ছেলেকে নিয়ে বিব্রত শিবাজী।

তাই রক্ষে। তাই আক্রমণটা তীব্র আকার ধারণ করে নি। তা না হলে কি হত কে জানে।

দুপুরের দিকে আর একটা দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে এল। মাস্কাপুরের গিরিপথে নাকি একদল মাওলা এসে তাঁবু গেড়েছে। সে তাঁবু কি গিরিপথ পাহারা দেওয়ার জন্য, না নতুন আক্রমণের প্রস্তুতি, কে জানে!

এ মুহূর্তে সতর্ক না হলে কেউ সর্বনাশ ঠেকাতে পারবে না।

রণদুল্লাকে ডেকে পাঠাল আদিল শাহ।

রণদুল্লা কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে বলল: আমাকে ডেকেছেন সুলতান?

হ্যাঁ খাঁ সাহেব, ডেকেছি।

কি হুকুম!

হুকুম নয়, অনুরোধ করব খাঁ সাহেব।

হুকুম নয় কেন সুলতান। এ বান্দা চিরদিন হুকুমই তালিম করে এসেছে আপনার। আজও তাই প্রত্যাশা করে।

আদিল শা করুণ চোখ তুলে তাকাল। বলল: হুকুম করার দিন তো গত হয়ে গেছে খাঁ সাহেব। বিজাপুর আজ খণ্ডিত। অর্ধেক শত্রুর হাতে। তবু...

তবু কি সুলতান?

তবু তো চেষ্টায় ক্ষান্তি দিলে চলবে না।

সে কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না সুলতান। এবার আমাদের মরিয়া হয়ে লড়তে হবে।

সে জন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি খাঁ সাহেব। আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভাবছিলাম নিজেই যাব যুদ্ধে।

সে কি কথা সুলতান? আমি থাকতে আপনাকে যেতে হবে কেন?

আপনি আর কটা দিক দেখবেন?

আমি সব দিক দেখতে সক্ষম।

তাহলে একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারি খাঁ সাহেব। দেখেছেন কিছুদিন যাবত শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তার উপর বিজাপুরী সৈন্যদের পরাজয়। চোখে আমার ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই।

রণদুল্লা খাঁ অভয় দিয়ে বলল : আপনি নির্ভয়ে থাকুন সুলতান। যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ কোন ভয় নেই।

কিন্তু আপনাকে একটা ব্যাপারে একটু সতর্ক করে দিতে চাই খাঁ সাহেব।

বলুন, দেশের দুর্দিনে কোন কথাই চেপে যেতে নেই। খোলাখুলি আলোচনা করাই ভালো।

সৈন্য বিভাগে যে সমস্ত কাফের উচ্চপদে বহাল আছে তাদের গতিবিধির প্রতি একটু সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

আপনি বলার আগেই আমি সজাগ সুলতান। তা না হলে শাহজীর সঙ্গে সওকত খাঁকে দিতাম না।

সওকত খাঁকে দিয়ে ভালোই করেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাজীকে দিয়ে ভুল করেছেন।

ভুল আমি করি নি সুলতান। জেনে শুনেই আমি ওকে পাঠিয়েছি ওখানে। আপনি জেনে খুশি হবেন যে সে আর ফিরে আসবে না। গোলকুণ্ডার সীমানায় যেখানে মাওলা সৈন্য আক্রমণ চালাচ্ছে সেখানে আমাদের জয় হোক আর পরাজয় হোক—সেখান থেকে কৃষ্ণাজী জীবিত ফিরছে না।

আপনারও তাহলে সন্দেহ হয়েছে ওকে ?

ওর কথাবার্তা যেন কিছুদিন যাবত কী রকম মনে হচ্ছিল।

তাই নাকি ?

ওর কথাবার্তা চালচলন আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করছিল। সেজন্যেই ঐ রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ গলার স্বরটা যথাসম্ভব খাট করে বলল : সওকত খাঁকে নির্দেশ দিয়েছি।

এ দিকের খবর কি ? বিশালগড় দুর্গ রক্ষার কি ব্যবস্থা করেছেন ? ঐ দুর্গ কি পারবেন দখলে রাখতে ?

বিশালগড় দুর্গ রক্ষার জন্য সুশিক্ষিত সৈন্য পাহাড়ের সানুদেশে মোতায়েন রেখেছি। তারা জান কবুল করে লড়াই করবে। তা ছাড়া আমি নিজে যাচ্ছি কাল।

আপনি যাচ্ছেন !

উল্লসিত হল আদিল শাহ। সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে রণদুল্লা খাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল: এটাই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত খাঁ সাহেব। আপনি না থাকলে কখন কি ঘটে বলা যায় না। অথচ বিশালগড় দুর্গ যাওয়া মানে সমগ্র বিজাপুর শত্রুর হাতে চলে যাওয়া।

আমি বুঝি জাঁহাপনা।

আশ্বস্ত হল আদিল শাহ। বেগম মহলের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল।

কি ভাবছেন জাঁহাপনা ?

বেগমমহলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রণদুল্লার মুখের উপর নিবদ্ধ রাখল আদিল শাহ। সে দৃষ্টি যেন উদভ্রান্ত, অসহায়।

দূরত্বের পরিসরকে সীমিত করে কাছে এল রণদুল্লা।

বলল: আবার কোন ভাবনা আপনাকে উন্মনা করছে জাঁহাপনা ? কিসের আশঙ্কা আপনার মনকে বিচলিত করছে, আমি কি শুনতে পারি না ?

ঘরের মেঝেতে পায়চারী করতে থাকল আদিল শাহ। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বার দুই তিন যাওয়া আসা করল। পদক্ষেপ খুব দ্রুত। মনের মধ্যে কোন দুশ্চিন্তা যেন ডানা-ভাঙ্গা পাখীর মত ছটফট করছে—তা তার চোখে মুখে পরিস্ফুট।

এক সময় থমকে দাঁড়াল। ঘরের মাঝমাঝি এক জায়গায় পদচারণা বন্ধ করল। তাকিয়ে দেখল রণদুল্লাকে। এমন ভাবে তাকাল যেন কোন অর্ধচেনা মুখ দেখছে।

কিন্তু এ বৈলক্ষণ্য কেন আদিল্ শাহের? কেন এ চাঞ্চল্য? ওর রণকুশলতার উপরে কি আস্থা হারিয়েছে আদিল শাহ?

উত্তর খুঁজে পাওয়ার আগেই আদিল শাহ মুখ খুলল: খাঁ সাহেব।

বলুন।

আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাইব।

নিশ্চয় চাইবেন।

আমার যেন মনে হচ্ছে বিজাপুর রাজ্যের উপর খোদার গজব পড়েছে।

আদিল শাহের কথা শুনে হো হো হেসে উঠল রণদুল্লা খাঁ।

আপনি হাসছেন খাঁ সাহেব? হাসির কথা নয়। বিজাপুর রাজ্যের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে আমার আশঙ্কাটা মিলিয়ে দেখুন একবার। খোদা খুশী থাকলে আমার রাজত্বকে আজকের অশুভ ছায়া গ্রাস করতে চাইত না।

হাসি থামিয়ে রণদুল্লা খাঁ বলল: ও সব বাজে ভাবনা রাখুন আপনি।

বাজে ভাবনা নয় খাঁ সাহের। কথার ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন না আমার আশঙ্কাটাকে। আমার ভাবনা যদি বাজে হয় তাহলে এত সৈন্য এত অস্ত্র শস্ত্র দিয়েও সামান্য সংখ্যক মাওলাকে রুখতে পারছি না কেন?

সাহসী সেনানীর ভঙ্গিতে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল রণদুল্লা। সে মুহূর্তে তাকে যেন উত্তেজিত দেখাল। তবু যতদূর সম্ভব সে উত্তেজনা চেপে রেখে ধীর গম্ভীর গলায় বলল: সব সময় জয়লাভ করব, এ কথা কি কোন বড় যোদ্ধাও ভাবতে পারে!

আশ্বাস বাণীতে ভুলল না আদিলশাহ। বলল: কিন্তু মনটা হতাশায় ভরে ওঠে কখন জানেন? যখন ভাবি গত আট দশ বছরের মধ্যে একবারও শত্রুপক্ষকে তেমন প্রত্যাঘাত হেনে স্তব্ধ করে দিতে পারলাম না।

তার সময় এবং সুযোগ অতীতে আসে নি। জাঁহাপনা একজন সুলতানের সুদীর্ঘ শাসনে সাত আটটা বছর তেমন কিছু নয়। কিন্তু কি বলতে চাইছেন জাঁহাপনা ?

কবে আমাদের হৃতপ্রায় নগর আবার একটার পর একটা জয় করে নিতে পারব ?

মাথা দোলাতে দোলাতে রণদুল্লা খাঁ নিশ্চুপ থাকল কয়েক লহমার মত। তারপর স্থির প্রত্যয়-দৃপ্ত কণ্ঠে বলল : আপনার এবং আমার আকাঙ্ক্ষিত সে সময় আবার এসেছে জাঁহাপনা। বিজাপুর রাজ্য মাত্র দুটো দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল। আক্রমণকারীরা এগিয়েও এসেছিল বেশ কতকটা। কিন্তু···গত কয়েকদিন ধরে কী দেখছেন ?

আদিল শাহ যেন এতক্ষণে আশ্বস্ত হল। বলল : হ্যাঁ খাঁ সাহেব। গত সাতদিন যাবত বড় রকমের কোন বিপর্যয়ের দুঃসংবাদ পাই নি। বরং একটা যুদ্ধবিরতির প্রাকমুহূর্তের মতই শান্তি বিরাজ করছে।

শুধু তা নয় জাঁহাপনা। শাহজীর বাহিনী বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। শুনেছি তিন তিনটে গ্রাম পুনর্দখল করেছে শাহজী।

এ খবরটা অবশ্যই আশাপ্রদ।

আশাপ্রদ খবর আরো আছে জাঁহাপনা। শিবাজীর ঘরেই শত্রু দেখা দিয়েছে। ওর বাহিনীতে নয়—ঘরে। নিজের পুত্র শম্ভাজী নাকি জয়সিংহের কাছে পরাজিত হয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে।

তার পরবর্তী ঘটনা তো সম্পূর্ণ বিপরীত। দিলীর খাঁর সহযোগিতায় শম্ভাজী ছাড়া পেয়ে আবার রায়গড়ে ফিরে গেছে।

ফিরে গেছে। কিন্তু শিবাজী ক্ষমা করেছে কি ?

তা ও করবে খাঁ সাহেব। বড় চতুর লোক শিবাজী। বহিঃশত্রুকে আঘাত হানতে গিয়ে ঘরে শত্রু থাকলেও ক্ষমা করে যাবে। অপত্য-স্নেহে বুকে টেনে নিয়ে ঘরের বিভেদ ঘুচাবে।

ইতিমধ্যে আমরাও শক্তি সঞ্চয় করে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে

তুলব। দুঃসাহসিক অভিযান চালাব। আমার বিশ্বাস এ অভিযানের মুখে শিবাজীর মাওলা বাহিনী স্রোতের মুখে তৃণ-খণ্ডের মত ভেসে যাবে।

আনন্দ আর বিস্ময়ে দুটো চোখ বিস্ফারিত হল আদিল শাহের। রণদুল্লা খাঁর মুখোমুখি দাঁড়াল। ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল। উল্লসিত করমর্দনের পর বলল : অসুস্থ শরীর না হলে আমিই নিতাম এই গুরু দায়িত্ব। এখন আপনি ছাড়া আর কেউ নেই যে এ দায়িত্ব পালন করে।

আমি বিজাপুরকে ভালোবাসি। ভালোবাসি বিজাপুরের সুলতানকে।

আশ্বস্ত হলাম খাঁ সাহেব। আমি ভেবেছিলাম বেগম আর সন্তানদের সরিয়ে ফেলব।

কোন প্রয়োজন নেই। কোন ভয় নেই।

আচ্ছা খাঁ সাহেব ?

হুকুম করুন জাঁহাপনা।

গলার স্বর নীচুতে নামিয়ে খুব আস্তে আস্তে আদিলশাহ বলল : শাহজীর জায়গায় সৈন্য-চালনা করতে পারে, এমন কে আছে আমার সৈন্যবাহিনীতে ?

কেন জাঁহাপনা ?

রণদুল্লা খাঁ বিস্ময় প্রকাশ করল।

শাহজী দুদিনের জন্য ছুটি চেয়েছেন।

কারণ ?

কারণ কিছু বুঝতে পারছি না। তবে প্রাথমিক ভাবে এটুকু বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে দেখা করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তারপর আমার সঙ্গে দেখা হলে কি বলবেন তা বলা শক্ত। যাই হোক, আপাতত একজন দক্ষ সেনাপতিকে পাঠাতে পারলেই ভালো হয়।

তা পাঠাচ্ছি জাঁহাপনা। নাসির খাঁকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার

দিকে পাঠাব ভাবছিলাম। ওকে সে দিকে না পাঠিয়ে বরং শাহজীর জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল রণদুল্লা।

কাশ্মিরী ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছিল আদিল শা। ভাবছিল শাহজীর কথা।

বিজাপুরের প্রধানতম শত্রুর জন্মদাতা শাহজী। আশ্চর্য মানুষ একজন। আশ্চর্য কর্তব্যপরায়ণ।

বিজাপুর সুলতানের কর্মচারী হয়ে এসেছিল কত বছর আগে? সেই দিনটিকে স্মৃতির সমুদ্র থেকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করল আদিল শা। মনে পড়ে না। খুঁজে পাওয়া যায় না। যত দূর মনে পড়ে শাহজী আদিল শাহের আমলের লোক নয়। সে এসেছিল আরও আগে। আদিল শাহের পিতার আমলের কর্মচারী শাহজী।

আশ্চর্য দায়িত্ব বোধ। আশ্চর্য শক্ত মানুষ। তারই ছেলে আজ মরা-বাঁচার খেলায় মেতেছে। যুদ্ধ করছে মোগলের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ করছে মোগলের দোসরদের বিরুদ্ধে। বিজাপুর ওর পরম শত্রু।

আর ওর শত্রু পক্ষের হয়ে কিনা শাহজী লড়াই করছে নিশান গিরিকন্দরে।

পুত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছে শুধু কর্তব্যেরই খাতিরে। বিজাপুর রাজকর্মচারী বলেই বিজাপুরের হয়ে লড়াই করা ওর নৈতিক দায়িত্ব। দায়িত্ব পালন করে চলেছে শাহজী। নিশান পার্বত্য পথে শিবাজীর বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে।

আজ দেখা করতে আসছে আদিল শাহের সঙ্গে। কি বলবে কে জানে? কি অভিযোগ আছে আদিল শাহের বিরুদ্ধে?

ঐ লোকটাকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল একদিন। ছেলের শত্রুতার জন্যে একান্ত বশংবদ পিতাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল আদিল শা!

কখন এসে পৌঁছবে তার স্থিরতা নেই। নাসির খাঁ বোধ হয় গত পরশু পৌঁছে গেছে। নাসির খাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে পুরো এক দিন সময় লাগবে।

এতক্ষণে এসে পৌঁছনো উচিত ছিল শাহজীর। সকাল বেলা যাত্রা শুরু করলে এ বেলা কেন এসে হাজির হতে পারবে না? মাত্র দেড়শো মাইলের পথ নিশান গিরিপথ।

সে পথ অতিক্রম করতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে শাহজীর তেজী ঘোড়া দুন্তের?

অকস্মাৎ মনে হল একটি ঘোড়া যেন বহুদূর থেকে ছুটে এসে নিজের গতিবেগ মন্থর করছে ওর খাসমহলের প্রধান তোরণের নীচে।

সত্যিই খাসমহলে ঢুকল শাহজী।

আসুন শাহজী। আসুন।

মুখোমুখি বসল দু জনে।

তারপর খবর বলুন শাহজী।

খবর ভালোই। গত চার পাঁচদিন যাবত কোন আক্রমণ আসে নি ওদিক থেকে। আমরাও নতুন করে এগোবার চেষ্টা করি নি। তার জন্যে আপনি কী ভাববেন আমি জানি না। তবে আমি অনেক ভেবে চিন্তে দখলীকৃত ঘাঁটিগুলোকে সুরক্ষিত করছি। একটানা এগিয়ে গেলে শত্রুপক্ষের প্রত্যাঘাতের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারব না হয় তো। তাই দাঁড়াবার মত ভিত শক্ত করে তারপর আবার অগ্রসর হওয়া যাবে।

তাকিয়ার উপরে কাত হয়ে বসল আদিল শা। ডান হাতের কনুই রাখল ফরাসের উপর। হাতের তেলোয় রাখল মাথা। তারপর বলল: আপনি যা করেছেন তার উপর কোন হালকা মন্তব্য করব না শাহজী। আমি জানি আপনি ঘটনাস্থলের হাওয়ার গতি বুঝেই কাজ করেছেন। তাতে আমার লাভই হয়েছে।

লাভ আরও হত জাঁহাপনা। কিন্তু হতে দিচ্ছে না আপনার প্রিয় রহিমউদ্দিন।

শাহজীর স্বরে বিষণ্ণ ক্ষোভ প্রকাশ পেল এবং একটু যেন ক্রুদ্ধ অভিযোগের আভাস।

সোজা হয়ে বসল আদিল শা। বলল: কী হয়েছে শাহজী? রহিমউদ্দিন কী করেছে?

আদিল শাহের কৌতূহলী চোখের দিকে তাকিয়ে শাহজী গম্ভীর অথচ স্পষ্ট গলায় বলল: রহিম উদ্দিন মোগলদের কায়দায় লড়াই করছে। ওর প্রধান শত্রু যেন হিন্দু। হিন্দুর দেব মন্দির ভেঙ্গে কী সুবিধা হবে রহিমউদ্দিনই জানে!

তাই নাকি?

হ্যাঁ জাঁহাপনা। আমরা যে এলাকা পুনর্দখল করেছি সেখানে একটি ভবানী মন্দির ছিল। সেটিকে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে রহিমউদ্দিন।

আদিল শা চুপ হয়ে থাকল।

শাহজী ব্যথিত কণ্ঠে বলল: আপনার নিশ্চয় মনে আছে আফজল খাঁর কথা। সে নিজেও করেছিল একই অপরাধ। ভবানীর মন্দির ধ্বংস করেছিল। আর সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল নিজের জীবন দিয়ে।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগল আদিল শা। বাইরে তাকিয়ে বলল: আমিও শুনেছি আপনার স্ত্রী ভয়ানক ধর্মভীরু। কোন দেবালয়ের ক্ষতি হলে তিনি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আর তখনই তাকে খুশী করার জন্য শত্রুপক্ষের উপর একটা বড় রকমের আঘাত হানে শিবাজী।

তারও সঙ্গত কারণ আছে জাঁহাপনা। ঐ মায়ের হাতেই যে মানুষ হয়েছে শিবাজী। স্নেহ ভালোবাসা যা পেয়েছে তা ঐ মায়ের কাছ থেকেই।

আদিল শা নীরব হয়ে রইল। শাহজীর কথার সত্যতায় কোন রকম সন্দেহের অবকাশ নেই। গত চৌদ্দ বছর যাবত শাহজী বিজাপুরেই আছে। বাবার সঙ্গে কোন সংযোগ নেই শিবাজীর এবং ওর মাতা জিজাবাঈএর সঙ্গে।

জিজাবাঈ ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে কোন রকম চেষ্টাই করে নি। কারণ জানা আছে আদিল শাহের। তুকাবাঈকে বিয়ে করে দ্বিতীয় বার ঘর বাঁধার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই খুঁজে পায় নি জিজাবাঈ। তাই বিরোধিতা করেছিল জিজা, যার ফলে শাহজী পুনা ছেড়ে চলে আসে তুকাবাঈএর হাত ধরে।

এই মুহূর্তে সে দিনের সব কথা মনে পড়ল আদিল শাহের। এই মানুষটাই তো বিজাপুরের সেবা করে এক দিন প্রতিদান স্বরূপ জায়গীর পেয়েছিল। জায়গীরটা কোন দিক থেকেই অবহেলার যোগ্য ছিল না। অনেকখানি উর্বর জায়গা সেই জায়গীরে ছিল। ছিল অনেকগুলো দুর্গ, অনেক পরিশ্রমী প্রজা। শুধু সেই জায়গীর নিয়ে থাকলেই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যেত ওর। শিবাজীও হয়ত এত দুর্ধর্ষ হয়ে উঠত না।

কিন্তু লোকটার মাথায় তখন ঢুকেছে তুকাবাঈ। তাকে নিয়ে আবার এল আদিল শাহের দরবারে। আদিল শাহেরও তখন দুর্দিন। বিজাপুর রাজ্যের বড় একটা অংশ দখল করে নিয়েছে আওরঙ্গজেব। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা রক্ষা করার জন্য যোগ্য লোকের প্রয়োজন। শাহজীর পূর্ব অভিজ্ঞতায় উচ্চপদে বহাল হয়ে গেল আদিল শাহীতে।

সে দিন থেকে সততার সঙ্গে বিজাপুর রক্ষার কাজ করে চলেছে শাহজী। পিতার অনুপস্থিতিতে ও-দিকে শিবাজীকে পেয়েছে নতুন নেশা। ওর রক্তের মধ্যে কাঁপতে শুরু করেছে নতুন স্বপ্ন।

সে স্বপ্ন সফল করার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে জিজাবাঈ। সে দিক থেকে ঠিকই বলেছে শাহজী। ভবানী মন্দির ধ্বংসের খবর জিজাবাঈ-

এর কাছে পৌঁছলে, সে জীবনপণ লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করবে শিবাজীকে। তা ছাড়া বিজাপুরের হিন্দু প্রজারাও এ কাজ সুনজরে দেখবে না। এতে নিজের ঘরের মধ্যে অঙ্কুরিত করা হবে বিদ্রোহের হাওয়া।

আবার অন্য দিক থেকেও দেখল ঘটনাটাকে। প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত যেখানে সংগ্রাম করতে হচ্ছে, সেখানে সব সময় ন্যায় নীতিকে মেনে চলতে কে পারে? প্রতিদ্বন্দ্বী যেখানে হিন্দু সেখানে হিন্দুত্বের উপরেও সময় সময় আক্রোশের অলক্ষ্য তীর গিয়ে পড়তে বাধ্য।

কিন্তু এদিকটা শাহজীর কাছে প্রকাশ করা যায় না। তা হলে ওকে পরধর্ম-বিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করা খুব সহজ হবে শাহজীর পক্ষে।

আমি আপনার সঙ্গে একমত শাহজী। বিজাপুরের কোন মুসলমান সৈনিক হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করুক এ আমিও চাই না। আপনার এবং আমার অনিচ্ছায় যা ঘটে গেছে তার জন্যে এখন কী করতে পারি বলুন?—বলল আদিল শাহ।

কিছু করতে গেলে নিজের ঘরে শত্রু বাড়বে। তার চেয়ে আপনি প্রচার করে দিন যে ঐ চূর্ণ মন্দির আবার গড়ে তুলতে যা খরচ লাগে সব দেবে আদিল শা। ভবিষ্যতে কোনো বিধর্মীর দেবালয় অপবিত্র বা ধ্বংস করা হবে না।

তাই করব শাহজী। আপনার উপদেশ গ্রহণ করলাম।

এবার আমার নিজস্ব আর্জি পেশ করব জাঁহাপনা।

কি আর্জি আপনার?

একরাশ বিস্ময় চোখে নিয়ে প্রশ্ন করল আদিল শা।

আমার আর্জি আপনার মনে দুশ্চিন্তারই উদ্রেক করবে জাঁহাপনা। তবু সে আর্জি পেশ না করে উপায় নেই। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। আগের মত রণক্ষেত্রে ছোটাছুটি করা এক রকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেটুকু করছি তা কেবল মনের জোরে। সে জন্যে বলছিলাম এবার আমাকে অব্যাহতি দিন জাঁহাপনা।

আমার এ দুঃসময়ে আপনি অব্যাহতি চাইছেন শাহজী? কাজে ইস্তফা দিতে চাইছেন? আর কিছুদিন পরে ছুটি নিলে হত না?

জাঁহাপনা আমার দেহ আর বইছে না।

আদিল শাহ পায়চারী করতে শুরু করল দরবার কক্ষে। হাত দু খানা পেছনে রেখে খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত করল বেশ কয়েক মিনিট। আপন মনে একটি শব্দ উচ্চারণ করল বার বার। ইস্তফা! ইস্তফা!

আপনার মনে কি অন্য কোন প্রশ্ন জাগছে জাঁহাপনা?—খুব সহজ অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল শাহজী।

প্রশ্ন?

থমকে দাঁড়াল আদিল শা। শাহজীর মুখের উপর চোখ রাখল। ওর দৃষ্টি দ্রুত ছায়া ফেলতে লাগল শাহজীর মুখে, চোখে, ঠোঁটে, নাকে।

শাহজী সহজভাবে হাসল। আদিল শাহের মন আজও সন্দেহ-হীন নয়!

শাহজী বলল: এ বান্দা আজন্ম বিজাপুরের ভালোই চেয়েছে জাঁহাপনা। আজও চাইছে। এবং সে চাওয়ার মধ্যে এতটুকু খাদ নেই। কাজেই আপনি আমার শরীরের কথা ভেবে আমাকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিন।

আপনার দেশপ্রেমে কোন ভেজাল নেই আমি জানি শাহজী। তবে কি জানেন? এতকালের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে এক কথায় অব্যাহতি দিলে আমার কাজ চলবে কি করে?

চলবে জাঁহাপনা। দুনিয়ায় কোন কাজই কারুর জন্য আটকে থাকে না। আপনার কাজও থাকবে না। আপনি আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমি আপনার ঐ দুর্গের কাছাকাছি কোথাও সপরিবারে বাস করব।

আমাকে একটু ভাবতে দিন শাহজী। একটা দিন সময় দিন।

বেশ। আদিল শা কাত করল তার দীর্ঘ দাড়িপুঞ্জ।

কাল এ সময় আমি আসব আপনার কাছে।

কাল গিয়েছিল রংমহলে। মরিয়মবাঈ তৈরী হয়েই এসেছিল। পরনে ছিল পেশোয়ারী ঘাঘরা। মসলিনের ওড়না ওপর থেকে গলা জড়িয়ে পিঠে ছড়ানো ছিল। চোখে সুর্মার টান। কোমরে চন্দ্রহার। একেবারে মনোমোহিনী মূর্তি।

আদিল শাহের হুকুমের অপেক্ষা করছিল মরিয়ম। সারেঙ্গীয়া প্রতীক্ষায় ছিল মরিয়মের ইশারার। নতুন সারেঙ্গীয়া। বাজায় ভালো। তবলচী খড়িচূর্ণ ছড়াচ্ছিল তবলার ওপর। আর ছোট্ট হাতুড়ি দিয়ে কড়া ঠুকছিল। ঠুং ঠাং, ঠাং ঠাং।

নাচের হুকুমের পরিবর্তে আদিল শা প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি কাল দুর্গের গুপ্ত পথের ধারে গিয়েছিলে মরিয়ম ?

মুখে কালির ছিটে পড়েছিল মরিয়মের। বলেছিল ঃ গিয়েছিলাম জাঁহাপনা। হঠাৎ একটা সোরগোল শুনে কৌতূহল জেগেছিল মনে। তাই গিয়েছিলাম।

কৌতূহল মেটাতে গিয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করার কী প্রয়োজন ছিল ?

আদিল শাহের গলা গম্ভীর এবং ভারী।

তবলচী হাতের হাতুড়ি জাজিমের উপর রেখে দিয়ে চোখ তুলেছিল। সারেঙ্গীয়ার কান হয়েছিল সজাগ।

আমার ক্ষমতার এখানে কি দাম আছে জাঁহাপনা ?

তোমার নাচে তোমার গানে আমি প্রীত বলেই তো তোমার প্রতি আমার অসীম মমত্ববোধ! আর আমার মমতাই তোমার ক্ষমতা !

আপনার মেহেরবান জাঁহাপনা।

কিন্তু তুমি সেই মমত্ব বোধের সুযোগ নিয়ে আমার শত্রু পক্ষের চরকে পালিয়ে যাবার পথ করে দিয়েছ!

শিশুর সারল্যে অপরাধীর ছায়া মুখে জড় করে মরিয়ম বলল, আমায় মাফ করবেন জাঁহাপনা! ও দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে আমি একদম ভাবি নি।

ভাবা উচিত ছিল মরিয়ম। শাস্তারাও বিদেশী তুমি জানতে?

জানতাম।

বিদেশী ও অজ্ঞাতকুলশীলদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই...কার মতলব কী থাকতে পারে কে জানে। লোকটা যে শিবাজীর অনুচর নয় জোর গলায় বলতে পার?

নিভে গিয়েছিল মরিয়ম।

জাঁহাপনা, আমার অজ্ঞানতার জন্য যা শাস্তি দেবেন দিন।

আদিল শা হঠাৎ মেরুদণ্ড সোজা করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, কেন তুমি লোকটাকে ছেড়ে দিতে বলেছিলে নজরদারকে?

মহব্বতের জন্য বেচারা জান কবুল করে দুর্গ ডিঙিয়ে প্রবেশ করেছিল। মহব্বতের মুখ চেয়ে ওকে ছেড়ে দিতে বলেছি জাঁহাপনা। যে বেচারা মহব্বতের জন্য পাগল তাকে কি হত্যা করা যায়? লক্ষ অপরাধ করলেও প্রেমিককে শাস্তি দেওয়া উচিত নয় জাঁহাপনা।

মহব্বত! অস্ফুটে কথাটা উচ্চারণ করে আদিল শা হাত বাড়িয়েছিল পারশ্যের তৈরী সুরার জন্য। রূপোর পাত্রে ঢেলেছিল সুরার ভাণ্ড। পরপর কয়েক পাত্র উজাড় করে দিয়েছিল গলায়। মরিয়ম তাকে সাহায্য করেছিল। বিরাট রাজত্বের প্রসারের কামনার চেয়েও কি মহব্বতের পিপাসা অপূরণীয়! কে জানে! কে বলতে পারে! কয়েক শত ক্রোশ জমি যেমন তাকে ছায়ার অবকাশ দিতে পারছে না, তেমনি কয়েক শত বেগম বাঁদী বাঈজীর নিকট সাহচর্যে থেকেও মহব্বত মিলছে না! এমন কী জিনিস? এমন কী দুর্লভ বস্তু এই মহব্বত!

বিড় বিড় করে বলল আদিল শা, বেশ করেছ ! আচ্ছা করেছ ! সাবাস বেটা ! তোর জয় হোক।

মরিয়মের ইশারায় সারেঙ্গীয়া তবলচি বীণবাদকরা তাদের যন্ত্রে হাত ছোঁয়াল। শুরু হল বাদ্য। মরিয়ম ধরল বসন্তবাহার। গানের স্পন্দনে আদিল শা দেহ দোলাতে লাগল। তাল ঠুকতে লাগল ফরাসে।

কয়েকদিন কাজে ব্যস্ত থাকলেও বসন্তবাহারের সুর সব সময় আদিল শার কানে রিন রিন করেছে। মনে হয়েছে এমন গানের মধ্যে জীবনটাকে ডুবিয়ে রাখতে পারলে ভালো হত !

দুর্গ প্রাসাদের স্থানে স্থানে সিপাহীদের পাকশালার লালচে আলো। চত্বরে বাগিচায় প্রান্তরে অন্ধকার ও চাঁদিনীর জড়াজড়ি মস্করা। তোরণে তোরণে খোজা হাবসীদের বীভৎস প্রহরা। বাতাস এনে দিচ্ছে ত্রাসের ও যুদ্ধের আশঙ্কা। প্রতি পলকে প্রতি নিঃশ্বাসে ভয় জাগে, এই বুঝি কিছু হল !

পাহাড় সদৃশ দুর্গটির মধ্যে আরণ্যক হিংস্রতা এখন বিশ্রামরত।

বসন্ত বাহারের লোভে আদিল শা এল জলসাঘরের সামনে। কিন্তু আজ জলসাঘর অন্ধকার কেন। কোথায় গেল যন্ত্রীর দল, কোথায় গেল মরিয়ম বাঈ। একটা বিড়ালের চোখ জ্বলছিল জলসাঘরে। বোধ হয় এখনো মদের ছিটে ফোঁটা পড়ে থাকবে। আদিল শার পায়ের শব্দে লেজ তুলে পালাল বিড়ালটা গা ঘেঁষে।

ভারী কপাট ঠেলে ঢুকল আদিল শা। গবাক্ষের কাছে দাঁড়াল। দূরে পর্বতমালার গায়ে চাঁদের ওড়না। রহস্যময়ী নারী মনে হচ্ছে পাহাড়কে। কিম্বা রহস্যময় অতিকায় পুরুষ। আফজল রণদুল্লা রহিম শাহজী এরা তার এক একটা স্তম্ভ। প্রধান স্তম্ভ পড়ে গেছে মাটিতে। বাকীগুলির ভরসায় এই রাজত্ব কতদিন অটুট থাকতে

পারে ? আর কত কাল শিবাজীর সঙ্গে লড়াই চালাতে পারা যাবে ! এক বছর ? দু বছর ? তিন বছর ? কিম্বা সারা জীবন ? সারা জীবন ঘোড়ার পিঠে আর সিংহাসনে বসে কেটে যাবে ?

যোদ্ধার জীবন তো এই রকম।

মহব্বত ?

যোদ্ধার শৌর্যের গোড়ায় যদি মহব্বতের ভিত্তি না থাকে তবে সে শৌর্য কতক্ষণ টিঁকতে পারে ? মোটেই বেশীক্ষণ টিঁকতে পারে না। এমন কোনো যোদ্ধা নেই,যার পিঠে কোমল হাতের ঠেলা অনুপস্থিত।

নিস্তব্ধ জলসাঘরে একা পায়চারী করতে বেশ লাগছে। গান বাজনার শব্দগুলি যেন অশ্রুতভাবে তার চার পাশে ছুটোছুটি করছে। অদৃশ্য পায়ের শব্দ, অদৃশ্য যুবতী বাঈজীদের ঘাঘরা ওড়ার শব্দ, অবাস্তব আতরের গন্ধ, যেন অনুভব করছে আদিল শা। তার সর্বাঙ্গ আবিষ্ট হয়ে গেল অলৌকিক মোহে।

বিলাস আর প্রাচুর্যের ভিতর ব্যস্ত থেকে থেকে সমস্ত কিছুর বাইরে থাকার স্বাদ সুলতানের অপরিচিত ছিল। ভিড় কোলাহল আর প্রমত্ততায় যেন উঁচুদরের আনন্দ নেই। একা—খুব জোর দুজনের উত্তাপ স্পর্শ গন্ধ ও আকর্ষণের অমূল্য দাম।

ভালোই হয়েছে ঝাড়লণ্ঠনের সহস্র বাতিগুলি নিভে থাকায়। চতুর্দশীর চাঁদ দুঃসাহসে স্ফটিক প্রস্তরের নক্সা আঁকা মেঝেতে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পেরেছে।

ভারী কপাটের খোলা পথে বারান্দায় এসে পড়েছে বাঈজীমহলের আলো। ফালি ফালি। ওই ফালি আলোর রেখাগুলি না থাকলে যেন আরও শোভন হত। হঠাৎ কেন অন্ধকারের মধ্যে চলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আদিল শার ? কে জানে।

শিবাজীর ভয়ে ? পরমায়ুর ক্ষীণতা চিন্তা করে ? আর কত বছর এ পৃথিবীতে বাস করতে পারবে সুলতান ? বড় জোর বিশ কি পঁচিশ বছর। সেই বছরগুলি কেমন ভাবে কাটবে কে বলতে পারে।

কে ?

কপাটের মাঝখানে প্রহরীর ছায়ামূর্তি।

মহম্মদ জাঁহাপনা।

কী খবর মহম্মদ ?

মরিয়ম বাঈজীর অসুখ হয়েছে জাঁহাপনা।

তুমি কি মরিয়মকে ডাকতে গিয়েছিলে ?

জাঁহাপনাকে জলসাঘরে ঢুকতে দেখে আমি ছুটেছিলাম।

সুনজরে পড়বার চেষ্টা প্রায় সকল কর্মচারীর। সবাই চায় পদোন্নতি। মাহিনা বৃদ্ধি। যদি সুলতানকে খুশী করতে পারে তাহলেই ওদের পদোন্নতি হবে, মাইনে বাড়বে। তার জন্য লক্ষজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে আদিল শার দিকে। গৌরব বোধে মনে মনে হাসল আদিল শা। কোলাহল, ভিড় নইলে যে আত্মতৃপ্তি নেই মহাপুরুদের। মহাপুরুষ বই কি। লক্ষ লক্ষ মানুষের যে: শিরোমণি তাকে মহাপুরুষ বলা কি অযৌক্তিক ? এই মাত্র ভাবছিল আদিল শা অন্ধকারের ভিতর, নির্জনতার ভিতর তার চলে যাবার আকাঙ্ক্ষা জাগছে মনে। সেটা বোধ হয় মাঝে মাঝে স্বাদ বদলের স্পৃহা। আসলে সে বহুলোকের সঙ্গপিপাসু।

কী হয়েছে বাঈজীর ? আদিল শা অন্ধকারের দিকে প্রশ্ন করল।

মাথার যন্ত্রণা আর জ্বর।

হাকিমকে সেলাম দাও।

দিই জাঁহাপনা। আলো জ্বালব জাঁহাপনা ? অন্য বাঈজীদের ডাকব ?

না মহম্মদ। তুমি যাও।

অন্ধকার সরে গেল।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল আদিল শা। জলাশয়ের জলটাও যেন কাঁপছে। কখনও নিকষ কালো, কখনও রূপোর মত ঝকঝকে সাদা দেখাচ্ছে।

সে দিকে তাকিয়ে আদিল শাহের বুকটা যেন কেঁপে উঠল হঠাৎ। এক দিকে মোগল অন্য দিকে মারাঠাদের আক্রমণ। আপাতত একটা বোঝাপড়া আওরঙ্গজেবের সঙ্গে হয়েছে। কিন্তু কদ্দিন টিঁকবে বলা যায় না। ওর যা সাম্রাজ্য লিপ্সা—কোন চুক্তিই সে হয়তো মানবে না।

তবু কিছু কর, কিছু বাড়তি টাকা-পয়সা দিয়ে মোগলদের বশ করে রাখলেও শিবাজীকে রোধ করবে কী দিয়ে? কখন কোন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোট্ট এই রাজ্যটুকু ছিনিয়ে নেবে শিবাজী তার ঠিক ঠিকানা নেই।

তখন? তখন কী করবে আদিল শা। আত্মহত্যা করে কি আত্মসম্মান বাঁচাতে হবে? অথবা ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাতে হবে? আফগানিস্থান, পারস্য কিংবা তুরস্কের দ্বারে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে? কিন্তু যা পথ—অতিক্রম করে কি সেখানে যাওয়া সম্ভব?

নানা দুর্ভাবনায় বিচলিত হল আদিল শাহের মন।

এমন সময় নির্জন জলসাঘরে একটা শব্দ হল। উৎকর্ণ আদিল শাহ জলসাঘরের ভিতরে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। কোথাও কাউকে দেখা গেল না।

জলসাঘরের এ দিকটা স্বচ্ছ হয়ে আছে চাঁদের আলোয়…বড় জোর এক পঞ্চমাংশ। বাকী অংশটুকু অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কে? মহম্মদ?

না, মহম্মদ তো জলসাঘরে ঢোকে না। তা হলে কিসের শব্দ হল? ভেবে ঠিক করার আগেই আবার শব্দ। এ শব্দ নারী-দেহের অলঙ্কারের। কে এই নারী? মরিয়ম অসুস্থ। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। কে এই নারী?

দরজার দিকে এগিয়ে গেল আদিল শাহ। আর একটা নতুন আওয়াজ পেল সে। কামিজের খস খস শব্দ।

কে?

কোন সাড়া নেই।

মনে হল কে যেন দরজার দিকে এগিয়ে আসছে।

কে?

আবার প্রশ্ন করল আদিল শা।

তখনও কোন সাড়া এল না।

আদিল শাহের হাতে কী একটা লাগল।

কে যেন পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু বেরুতে দিল না আদিল শা। সজোরে টেনে আনল নিজের কাছে। অন্ধকারে চিনবার চেষ্টা করল। চিনতে পারল না অপরিচিতাকে।

ততক্ষণে মুখ খুলেছে সেই নারী।

ছেড়ে দিন জাঁহাপনা, ছেড়ে দিন।

কে? কে তুমি?

আরও কাছে টানল আদিল শা।

আমি চোর নই জাঁহাপনা। আমি ··

তোমাকে মোটেই চোর মনে হচ্ছে না। কিন্তু কে তুমি?

আমি বীরাবাঈ।

বীরাবাঈ!

হ্যাঁ, জাবেলীর রাজকন্যা।

ও তুমি! এত দিন পরে দয়া হয়েছে!

কী বলছেন জাঁহাপনা? কী করছেন? ছেড়ে দিন।

আদিল শাহের আলিঙ্গনে ছটফট করতে লাগল বীরাবাঈ।

কত কাল পরে তুমি এলে! কত অপেক্ষা করে আছি!

ওকে আরও নিবিড় করে ধরল আদিল শা।

আপনার পায়ে পড়ি জাঁহাপনা আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনার বন্ধুকন্যা বীরাবাঈ। আপনার কন্যার মত।

সুন্দরীদের সঙ্গে পুরুষের কোনো সম্পর্কের বাধা সৃষ্টি করতে নেই। মহম্মদ, দরজা বন্ধ করে দাও।

দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। আর চীৎকার ছেড়ে কেঁদে উঠতে চাইল বীরাবাই।

কিন্তু ওর আর্ত চীৎকার ছড়িয়ে পড়ার আগেই আদিল শাহের দক্ষিণ হস্ত চাপা পড়ল ওর নরম দুটি ঠোঁটের উপর।

বলিষ্ঠ দুই মুঠোর মধ্যে কোমল দুটি বাহু চেপে ধরে অলিন্দে টেনে নিয়ে গেল সুলতান। নিয়ে যাবার সময় বলছিল, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে। অন্তত একটু আলো চাই।

এই মাত্র আদিল শা অন্ধকারের প্রশস্তি গাইছিল মনে মনে। এখন দেখল শুধু অন্ধকারে জীবন অচল। কেবল ভূতপ্রেতরাই অন্ধকারে থাকতে পারে। যে জীবের কামনা বাসনা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে তাদের কাছে আলো অপরিহার্য।

কান্দাহারের রঙীন বুলবুলের চিত্রালী ডানা দুটি ছটফট করছে সুলতানের মুঠোয়। অস্থিরতায় বুলবুলের মুখ আরক্তিম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন আবির দিয়ে তৈরী করেছে সুন্দর এক পুতুল।

তুমি সুন্দর! তুমি বেশ সুন্দর বীরাবাই।—কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল সুলতান।

কান্না-ছলছল দুটি আয়ত চোখ তুলে ধরল বীরা।

জাঁহাপনা।

আবেগ কাঁপা গলায় বলল আদিল শা।

কী বলছ সুন্দরী?

আপনি আমার আশ্রয়দাতা—রক্ষক!

তোমায় তো আমি নিরাশ্রিত করছি না। দেশের সব চেয়ে দুর্গম আশ্রয়ে বর্তমানে তুমি আছ। আমার আলিঙ্গন বিজাপুর রাজপ্রাসাদের চেয়েও দুর্ভেদ্য। তোমায় তো আমি হত্যা করছি না। মৃত্যুকে নিশ্চয় কেউ আনন্দ দিতে চায় না! কেন অমন করছ?

বীরাবাঈএর দেহ ক্রমশ সুলতানের দেহের নিকটবর্তী হচ্ছে আর বীরাবাঈ হাত পা ছুঁড়ছে।

আপনার ক্ষণিক আনন্দের জন্য আমার সারা জীবন আপনি নষ্ট করবেন জাঁহাপনা? ছেড়ে দিন। আপনি আমায় দয়া করে ছেড়ে দিন। দুটি পায়ে পড়ি আপনার।

গভীর গম্ভীর গলায় সুলতান বলল, কেউ দেখবে না, কেউ কেউ জানবে না। মরিয়ম জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ। মহম্মদ দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মহম্মদ কাউকে কিছু বলবে না। যদি কোনোক্রমে মহম্মদ প্রকাশ করে আর আমি তা জানতে পারি তাহলে মহম্মদ জানে তাকে তৎক্ষণাৎ কোতল করা হবে।

আমার প্রণয়ীর নিকটে আমি অপবিত্র হয়ে যাব জাঁহাপনা। প্রেমের দিকে তাকিয়ে একজন খাঁটি প্রেমিকার অবমাননা করবেন না জাঁহাপনা।

কে তোমার প্রণয়ী?

শান্তারাও।

ও সেই গাংফড়িঙ? দুর্গ ডিঙিয়ে তোমার সঙ্গে মহব্বত করতে এসেছিল?—লঘু সুরে বলতে বলতে হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠে আদিল শা বলল, বীরা আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।

সত্যি সত্যি ছেড়ে দিল সুলতান।

বীরা ছিটকে অলিন্দের বেষ্টনীকে আঁকড়ে ধরল। মুহূর্তে তাকাল নীচের দিকে। ত্রিশ চল্লিশ হাত নীচে মাটি। চতুর্দিকে অন্ধকারকে গ্রাস করার প্রয়াসে মত্ত চতুর্দশীর চাঁদ।

পায়ে পায়ে বীরাবাঈএর নিঃশ্বাসের পরিধিতে গেল সুলতান। ওর ডান হাত ধরে নিজের বুকের উপর রাখল।

দেখ, কত তীব্র উত্তাপ আমাকে অহরহ ছাই করে চলেছে। তুমি জান না জীবনে আমি মহব্বত পাই নি। সবাই আমাকে হয় জানোয়ার, নয় সুলতান বলে দেখেছে। কেউ দেখে নি প্রেমিক বলে। তুমি আসবে আমার কাছে প্রণয়িনীর মহিমা নিয়ে? আসবে কাছে?

বীরাবাঈ নিশ্চুপ।

ওর ডান হাত সুলতান নিজের দু হাতের মধ্যে নিয়ে বুকে চেপে ধরেছে।

কী, আসবে? থাকবে আমার কাছে?

পাহাড়ের কাছে এক ঝাঁক বাদুড় চেঁচামেচি করে উঠেছে। সেই দূরাগত শব্দ অবশ্যই দুর্গের ঝিম ভাঙাতে পারছে না।

নির্বোধের চাউনিতে বীরাবাঈ দেখছে সুলতানকে।

কী, থাকবে? তোমার কোনোদিন অসম্মান করব না।

এমন তো কত মেয়েকে কথা দিয়েছেন জাঁহাপনা···বীরা বলল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, কোনো কথাই কি আজ পর্যন্ত রেখেছেন?

রেগে উঠল আদিল শা, কাকে কথা দিয়ে কথা রাখি নি? একটা নাম বল!

নাম বলে কী হবে!

না, বলতে হবে।

মিছেমিছি আর এক জনের সর্বনাশ করতে আমি পারব না জাঁহাপনা।

তাহলে নিজের সর্বনাশের জন্য তৈরী হও।

আচমকা এক টানে বীরাবাঈকে সুলতান অলিন্দের জ্যোৎস্নার প্রকাশ্যতা থেকে জলসাঘরের অন্ধকার গোপনতায় ছুঁড়ে ফেলল। তারপর হাঁসের প্রতি লক্ষ্য করে যেমন শেয়াল ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি সুলতান লাফিয়ে পড়ল চঞ্চল জমাট অন্ধকারটার উপর।

বীরাবাঈ ভেবেছিল আর কিছু না পারুক, চীৎকার করে সকলের সামনে অপ্রতিভ করবে সুলতানকে।

কিন্তু চরম মুহূর্তে চেঁচাতে গিয়ে দেখল, মুখ থেকে শুধু অস্পষ্ট করুণ বীভৎস এক গোঙানীর শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরুচ্ছে না। জলসাঘরের গম্বুজে গোঙানীর শব্দ বর্শার ফলকের মত সূচীমুখ হয়ে শীর্ষদেশে উঠতে লাগল....আর ঘুরে ঘুরে গোল হয়ে মসৃণ পাথরের

মেঝেতে নামতে লাগল। ফলে গুঞ্জন ও গমগম মিলে এক অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করল।

সুলতান কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলল পাথরে। বীরাবাঈ নিথর। ওর পায়ের কাছে জ্যোৎস্না পড়েছে। অলক্তকরঞ্জিত পা ছুটি সুলতান একবার তার বুকে চেপে ধরল।

দুরন্ত আবেদন নিবেদন এখন স্থির হয়ে আদিল শার বুকে প্রবেশ করছে। স্থির ছুটি অলক্তকরঞ্জিত পা।

করুণা হল মেয়েটির প্রতি। ওর আবেদন ওর প্রার্থনা ওর গর্ব-ওর সব কিছু আদিল শার ওপর নির্ভর করছিল—এই প্রমাণ না দিলেও চলত। একটা ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে সিংহ দেখাবে, যে তার কী প্রচণ্ড ক্ষমতা? তবু মাঝে মাঝে ক্ষমতার পরীক্ষা করতে বালির বুকেও পদাঘাত হেনে চিহ্নের গভীরতা মাপতে হয়।

অনায়াসে মেয়েটি তাকে ভালোবাসার শেকলে ডালকুত্তা বানিয়ে রাখতে পারত। হ্যাঁ, ওর ভালোবাসায় আদিল শা হাবসীর চাইতে এক চুল কম অনুগত হত না।

গোঙানীর শব্দ পেয়েই হয়তো জ্বরতপ্ত দেহ নিয়ে ঘরের বাইরে এল মরিয়ম।

জলসাঘরের সামনে এসে দেখল মহম্মদকে। প্রহরারত ভঙ্গি।

রংমহলে কে কাঁদে মহম্মদ?

মহম্মদ থতমত খেয়ে কি বলবে খুঁজে না পেয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল। ঢোক গিলল বার দুই।

মহম্মদ!

কোন সাড়া না পেয়ে চাপা গলায় গর্জন করে উঠল মরিয়ম।

চমকে উঠল মহম্মদ। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল নিজেকে। বলল: কোথায়....কে কাঁদে?

রংমহলে?

আবার বিচলিত দেখাল মহম্মদকে। আমতা আমতা করে

বলল: কৈ? আমি তো কোন কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না বাঈজী সাহেবা।

জ্বরতপ্ত চোখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল মরিয়মের। ক্রুদ্ধ ও চাপা কণ্ঠে বলল: আসরের সামনে মিছে কথা বলছ মহম্মদ? তুমি শুনতে পাচ্ছ না গোওানী? তুমি শুনতে পাচ্ছ না কারুর অসহায় কান্না?

পাচ্ছি বাঈজী সাহেবা। কিন্তু···

কিন্তু কী মহম্মদ? তুমি জান ভেতরে কে। জান কী হচ্ছে মহম্মদ। জলসাঘর আনন্দের জন্য। দুর্গের বিষণ্ণ আবহাওয়াকে খুশীর বন্যায় প্লাবিত করার জন্যই রংমহল। আর সে রংমহলেই কি না নারীর অসহায় কান্না!

দরজায় ধাক্কা মারল মরিয়ম। দেহের সব শক্তি দিয়ে আঘাত হানল লৌহদ্বারে। ওর হাতের ধাক্কা শুধু শব্দ তুলেই শেষ হয়ে গেল। দরজা খুলল না। অধীর হয়ে উঠল মরিয়ম, মহম্মদ! দরজা খুলে দাও। জাঁহাপনাকে খবর দাও। নিশ্চয় কোন অসহায় রমণীকে ধরে এনেছে রণক্ষেত্র থেকে। আর তার....

বাকী কথা শেষ করা হল না মরিয়মের। ততক্ষণে ভিতর থেকে গম্ভীর গলা শোনা গেল।

দরজা খুলে দাও মহম্মদ।

ঐ গলা শুনবে আশা করে নি মরিয়ম। ঘটনার আকস্মিকতায় দমে গেল।

বেরিয়ে এল আদিল শা। তবু বিশ্বাস করতে পারল না নিজের চোখকে। সন্দেহ হল নিজের দৃষ্টি শক্তির উপর। দুটো জ্বরতপ্ত চোখ মুছে ভালো করে তাকাল ~~আদিল শাহ~~।

চোখের কোলে ক্লান্তির ছায়া। ঘামে চকচক করছে মুখ। মুখের ডান দিকটায় ক্ষীণ একটা রক্তের রেখা। কাছ থেকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় নখের আঁচড়ের গভীর দাগ।

কী করলেন জাঁহাপনা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে নিজে তৈরী করেছিলেন এই জলসাঘর, সেই উদ্দেশ্যকে নিজে গলা টিপে হত্যা করলেন! যেখান থেকে খুশীর ফোয়ারা ছড়াবার কথা সেখানে কান্নার উৎস তৈরী করলেন!

কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই আদিল শাহের।

গম্ভীর গলায় ডাকল, মহম্মদ!

ছুটে এসে কুর্নিশ করল মহম্মদ।

ভিতরে যাও। ওটা সরিয়ে নিয়ে এস। একটু সরাব খাইয়ে দাও ওকে। যদি সুস্থ হয়, ওকে বাঁদীদের দিয়ে তুলিয়ে ওর ঘরে পৌঁছে দেবে। নইলে খবর দেবে জহ্লাদকে।

বারান্দার ফালি ফালি আলোগুলিকে পায়ে পায়ে সরাতে সরাতে সুলতান অদৃশ্য হল।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মরিয়ম।

মহম্মদের অঙ্গ সঞ্চালনে আকৃষ্ট হয়ে মনে পড়ল রংমহলে অসহায় কান্নার কথা। মহম্মদকে অনুসরণ করল। মহম্মদ জ্বেলে দিল ঝাড়-লণ্ঠনের একটা মাত্র বাতি। আবছা আলোয় মহল যেন পাণ্ডুরুগী।

মসৃণ পাথরে পড়ে থাকা নারীমূর্তির দিকে ছুটে গেল মরিয়ম। পায়ের গোছ থেকে চাঁদের আলো তখন সরে গেছে। মূর্তিটিকে চিনতে মরিয়মের মুহূর্ত দেরী হল না। দু হাতে জড়িয়ে শোকার্ত চাপা কান্নায় বীরাবাঈ-এর শরীরে মুখ ঘষতে লাগল মরিয়ম। আর অজস্র স্নেহ ঢালতে লাগল।

আপনি সরে যান বাঈ সাহেবা।—মহম্মদের নিষ্ঠুর গলা।

তুমি সরে যাও। ফুঁসে উঠল মরিয়ম।

আমার কর্তব্যে বাধা দিচ্ছেন সুলতান জানলে আপনার শাস্তি হবে।

হোক। তবু আমার চোখের সামনে একটা জীবন কিছুতেই শেষ হতে দেব না।

আপনার ভালোর জন্যই বলছি বাঈজী সাহেবা। আপনি যান। ওর জ্ঞান আপনা থেকেই ফিরে আসবে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলেই উঠে বসবে বীরাবাঈ।

যদি না ওঠে?

জহ্লাদকে ডেকে দেব। এই জলসাঘরের নীচে···

নীচে কী মহম্মদ?

কেন। আপনি জানেন না বাঈজী সাহেবা?

না। নীচে কী বল?

পুঁতে দেবে।

আঁ···মরিয়মের দীর্ঘ আর্তনাদ গোল গম্বুজের স্তরে স্তরে বেলোয়ারী কাচের ঝনৎকারে এবং জলসাঘরের ভূগর্ভে বহুক্ষণ বীভৎস ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলল।

মহম্মদের ভাষা শুনে জ্যোৎস্না যেন পলায়ন করেছে মেঝের বর্ণালী প্রস্তরের স্পর্শ ত্যাগ করে। ঝাপসা চোখের জলের মত বিরাট আকাশের চোখে জ্যোৎস্না ভাসছে....কিম্বা কুয়াশা।

মহম্মদ বলে চলেছে: কত সুন্দরী যে এই জলসা ঘরের নাচ গান ও স্ফূর্তির নীচে জীবন্ত ঘুমোচ্ছে কে জানে। কত বাঈজী কত গাইয়ে। জলসাঘরের বুকে নাচে—গান গায়—বিলাসের শত রামধনু শত খান করে রূপসীরা, আর জলসাঘরের হৃদয়ে তারা প্রায় সবাই ঘুমোতে যায় এখানকার খেলা সাঙ্গ হলে। জলসাঘরে যে পা দিয়েছে তার আর মুক্তি নেই—হয় পাথর, নয় মাটি তাকে বুকে চেপে রেখে দেবে।

মরিয়ম মৃত প্রিয়জনের মত বীরাবাঈএর পাশে বসে শুনছে মহম্মদের কথা। আর তার দু গাল বেয়ে অনবরত ঝরে যাচ্ছে চোখের জল। দীর্ঘকাল কাঁদে নি মরিয়ম। আঘাতে আঘাতে কান্না ভুলে গিয়েছিল।

মহম্মদ আবার নিজেই শুরু করল।

আমার পঁয়তাল্লিশ বছর জীবনের উনত্রিশ বছর কাটল এ দুর্গে। আমার চোখের সামনে অন্তত সাত জনের ঠাঁই হয়েছে জলসাঘরের তলায়। সাত জনের মধ্যে গাইয়ে একজন। বাকী সবাই বাঈজী। আপনার ঠিক পায়ের তলায় ঘুমোচ্ছে সাকিনা বাঈ···মহম্মদ গোটা ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখাতে দেখাতে তলোয়ারের খোঁচা মারছে মাঝে মাঝে আর বলছে, এইখানে মিনাবাঈ, এখানে রাবেয়া, এখানে মণিবাঈ.... এখানে—এর নামটা ভুলে যাচ্ছি সেরিমা বাঈ না সেলিমা বাঈ ঠিক মনে পড়ছে না। আর এইখানে রুণী বাঈ যার জন্য প্রধান বেগম জুলেখার মহব্বত হারাল সুলতান। জুলেখার আপন ফুফার মেয়ে রুণী। দিদির সঙ্গে মোলাকাত করতে এসে নজরে পড়ে গেল সুলতানের। রুণীকে পাহাড়ের মত ভেট দিয়ে হাত করল সুলতান। অপরিচিত বাঈজীদের সঙ্গে সুলতান যাই করুক জুলেখা তাতে কোনো বাধা দিত না। মনে মনে জ্বলত জরুর। কিন্তু মুখে বলত না। রুণী জুলেখার অনেক ছোট। জুলেখার চাইতে রুণী বহুত তাজা। শেষে রুণীর কাছে পরাজিত হতে হবে বলে, ছোট হতে হবে ভেবে, জুলেখা বোনকে অনেক বোঝাল। কাশ্মীর চলে যেতে বলল। রুণীও তখন মজে গেছে। দিদির পাশের ঘর ছেড়ে এক রাতে পালাল জলসামহলে। রুণী নাচতে জানত। ভেবেছিল বাঈজীর ছদ্মবেশে থেকে যাবে আদিল শার হারেমে। কিন্তু বেগমের সওয়ানি নিগার সব খবর এনে দিল। রাতারাতি রুণীকে এইখানে কবর দেওয়া হল। হ্যাঁ মৃত্যুর আগে কিছু দিন রুণী সত্যি সত্যি বাঈজী হয়ে ছিল। তাই ওকে সবাই রুণীবাঈ বলে। একমাত্র রুণীবাঈ ছাড়া আর সবাইকে পোঁতা হয়েছে বাদশার হুকুমে।

বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল বীরা। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল ওর।

বলল: আমার জ্ঞান কেন ফিরিয়ে আনলে মরিয়ম। কেন আমাকে বাঁচিয়ে তুললে?

তোমাকে ভালোবাসি বলে।

কিন্তু আমার এই কলুষিত জীবনকে নয়। আর কেউ ভালোবাসবে না। এবার ঘৃণা করবে সবাই।

কেউ ঘৃণা করবে না ভাই বীরা। যা হয়ে গেছে তার জন্য তুমি দায়ী নও। কিন্তু তুমি কেন এসেছিলে এখানে?

আমি এসেছিলাম তোমার খোঁজে। ভেবেছিলাম জলসাঘরেই তোমাকে পাব। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম জলসাঘরে ঐ পশুটার অস্তিত্ব, তখনই পালিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম। নিঃশব্দে সরে পড়তে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারলাম কোথায়? পারলাম না। কিছুতেই লাফিয়ে পড়তে পারলাম না। কেন মরতে পারলাম না— কেন কেন .....বীরাবাঈ কাঁদতে লাগল আকুলভাবে।

বীরাবাঈকে সঙ্গে করে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল মরিয়ম।

মহম্মদ বলল : কাজ ভালো হচ্ছে না বাঈজী সাহেবা।

তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন মহম্মদ? জবাবদিহি আমিই করব।

ঘরে কাশ্মিরী গালিচা পাতাই ছিল। তার উপরে ছড়িয়ে দিল একখানা মণিপুরী ওড়না। বলল : বস ভাই বীরা।

বীরাবাঈয়ের পা কাঁপছিল। দেহ টলছিল। আস্তে আস্তে বসল বীরা। শুয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

গজদন্ত নির্মিত আলমারী খুলল মরিয়ম। থরে থরে কত পোষাক। যেন রঙের বাহার। কতকগুলি রঙিন শাড়ি সেমিজ টেনে আনল মরিয়ম।

বহুক্ষণ কেঁদেছিল বীরা। ওকে বলকারক দ্রাক্ষাসব খাইয়ে মরিয়ম একটু শান্ত করতে পেরেছে। গোলাপী চোখের কোলে নীল শিরার রেখাগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাত্রির প্রশান্তি আস্তে আস্তে

ঢেকে দিয়েছে ওর বিমর্দিত চেতনা। মরিয়ম ওকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পালঙ্কের উপর দুটি রমণীর নিদ্রার প্রবাহে রাত্রি ভেসে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের দুটি রমণী। ভাগ্য তাদের ঠেলে দিয়েছে সঙ্গমস্থলে। হয় তো একে অপরের মর্ম পুরোপুরি বোঝে না, তাদের জীবনের গতিপথ একেবারে ভিন্ন, হয় তো এমন দিন আসবে যখন তারা চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সব অমিল সত্বেও আজকে তাদের হৃদয় পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে নিদ্রিত ভাষা বিনিময় করছে।

এপাশ ওপাশ করতে লাগল বীরাবাঈ। মনের মধ্যে ভাবনার মিছিল। এ কী হয়ে গেল? এ কী অঘটন ঘটে গেল? যে আশঙ্কাকে এতকাল দু'হাতে ঠেলে রেখেছিল সে আশঙ্কার এমন কুৎসিত রূপ কে জানত আগে?

রাত তখন কত কে জানে। হঠাৎ শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল মরিয়মের।

এ কী! বিছানা ফাঁকা কেন? একটু আগেকার শব্দের সঙ্গে বীরার অনুপস্থিতির যোগসূত্র খুঁজতে চেষ্টা করল।

সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালল মরিয়ম। সে আলোয় যা দেখল তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নীচে জাজিমের উপর কাত হয়ে পড়ে আছে বীরাবাঈ। উপরের বেলোয়ারী বাতির আংটায় ঝুলছে শাড়ির একটা প্রান্ত।

এক নজর তাকিয়েই মরিয়ম বুঝল বীরাবাঈ কি করতে চেয়েছিল। এ কী হঠকারিতা? এ কী পরাজয়ী মনোভাব বীরাবাঈয়ের? আদিল শাহ অন্যায় করেছে ঠিক। কিন্তু তার অপরাধের জন্য কেন মৃত্যুবরণ করবে বীরা? অপরাধের শাস্তি যদি পেতে হয় আদিল শাহেরই পাওয়া উচিত। তা না করে নিজের জীবনের উপরই যবনিকা টেনে দিতে চলেছে বোকা মেয়েটি।

পালঙ্ক থেকে লাফ দিয়ে নামল মরিয়ম। কাছে গিয়ে বলল, এ কী করছ ভাই বীরা ?

বীরাবাঈয়ের মুখে কথা নেই।

ওকে দু হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিল মরিয়ম !

কী করতে যাচ্ছিলে তুমি ?

অনেক ভেবে দেখেছি আর আমার বেঁচে থাকা চলে না।

খুব চলে। তোমারই বেঁচে থাকা দরকার।

না, না মরিয়ম। এই দেহ নিয়ে আর এক মুহূর্ত বাঁচতে চাই না।

বীরাবাঈয়ের মাথায় পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল মরিয়ম।

ভেবে দেখেছ তোমার প্রণয়ীর কথা ? ভেবে দেখেছ কি সেই মারাঠা বীরের ভবিষ্যত ?

তার কথা ভেবেই তো জীবনকে শেষ করতে চাই।

যদি কোন দিন এ দুর্গ শিবাজী দখল করে আর শান্তারাও খোঁজ নিতে আসে—তখন আমি কী জবাব দেব বলতে পার।

কেন ? তুমি বলবে—এ কলঙ্কিত মুখ তাকে আমি দেখাতে পারব না বলেই মরেছি।

সে কিন্তু তোমার এ মত সমর্থন করবে না ভাই বীরা। মানুষের মনের পরাজয়ী মনোভাবকে তারা চিরকাল ঘৃণা করে।

মরিয়মের স্তোকবাক্যে আশার ছটা দেখে উঠে বসল বীরাবাঈ। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা। এখন মনে হচ্ছে ভাগ্যিস শাড়ির গিঁট খুলে গিয়েছিল।

তুমি কী বলছ মরিয়ম ! এমন মেয়েকে কোনো পুরুষ ভালো-বাসতে পারে ?

পারে।—রহস্যময় হাসি মরিয়মের।

শান্তারাও পারবে ?

পারবে।

তুমি জানলে কী করে? সে কি তোমার পূর্ব পরিচিত?

খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল মরিয়ম।

হাসছ যে?

পূর্ব পরিচিত না হলে একজনের সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা যায় না?

সাধারণত যায় না।

কখনো কখনো যায়ও।

এ সব তোমার নিছক অনুমান।—দীর্ঘশ্বাস ফেলল বীরাবাঈ।

হ্যাঁ, নিছক অনুমান। কিন্তু নিছক অনুমান বলে অত বড় দীর্ঘশ্বাসে একে উড়িয়ে দেওয়া চলে না বলছি বীরাবাঈ। চল ওঠ। কার্নিশে যাই।

ওরা দুজনে গম্বুজের কার্নিশে গিয়ে দাঁড়াল। দূরে পাহাড়ের বুকে আলেয়ার আলো। জ্বলছে নিবছে। আকাশে অজস্র তারার উজ্জ্বল আলো। ভোরের শীতল বাতাস ভেসে আসছে আরব সাগর থেকে। হাওয়ায় লেগে আছে সামুদ্রিক ফেনার গন্ধ। স্বাদটাও হয়তো লোনা।

বীরাবাঈএর কাঁধে হাত রেখে গালে গাল চেপে মরিয়ম বলল, বীরা আর একটা পথ আছে…

বুঝতে পেরেছি, তুমি কী বলতে চাও। কিন্তু সে আমার দ্বারা হবে না।

কী বলছি বল দেখি?

এক দম চেপে যাওয়া। শান্তকে কিছুই না জানানো। ঠিক কি না?

ঠিক।

না না…এ অসম্ভব মরিয়ম। ওর কাছে আমি অসৎ থাকতে পারব না চিরকাল। হয় ওর কাছ থেকে একেবারে সরে যেতে হবে, নয় ওকে বলতে হবে। যা করবার ও করুক বিচার করে'।

সিপাহশালার হাঁক দুর্গপ্রাসাদ উপচে উঠল। শেষ প্রহরের সাবধানবাণী। ফটকে ফটকে প্রহরারত অশ্বারোহীরা একবার সচকিত হয়ে উঠল।

মরিয়মের অন্তর হঠাৎ কেন যেন কেঁপে ওঠে। শীতল হাওয়ার ঝলকে ? কে জানে। অথবা তার নিজের জীবনের বিপদ সম্ভাবনায় ? বীরার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা মনে এসেছে তার। কিন্তু তাতে বীরার চাইতে অধিকতর বিপদ মরিয়মের। হোক। বীরাকে বাঁচাতে হবে।

বীরা আজই এই নরক থেকে পালিয়ে যাও।

কী করে যাব ? ফটকে নজরদার রয়েছে।

ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

যেমন কথা তেমন কাজ। রাত শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। মরিয়ম ব্যস্ত হয়ে উঠল। আলমারী খুলে বোরখা বের করল মরিয়ম। বোরখা এগিয়ে দিল বীরার দিকে।

এটা পরে সোজা বেরিয়ে যাবে।

যদি ফটকে পথ আগলায় নজরদার ?

আগলাবে না। আমার বোরখা ওদের চেনা।

যদি জিজ্ঞেস করে এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছি ?

বলবে রণদুল্লার কাছে।

যদি আবার প্রশ্ন আসে কেন ?

সে প্রশ্ন আসবে না।

অন্ধকারে আমি কী করে যাব ? কী করে পথ চিনব ?

রাত আর বেশি নেই। দুর্গের বাইরে চলে যাও। অন্ধকার থাকতে থাকতে যতটা পার হাঁট। তারপর রাত শেষ হলে দিনের আলো ফুটলে রায়চুরের সীমানা পার হয়ে চলে যাবে।

বীরাবাঈয়ের চোখে মুখে উত্তেজনা। আশা আর নিরাশার আলো আঁধারি।

তাহলে এক্ষুণি বেরিয়ে যাই ?

যাও। নজরদার যদি হাঁক দেয় ভয় পেয়ো না যেন। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে বলবে, মরিয়ম বাঈজী। আমার যত্রতত্র যাতায়াত ওদের গা সওয়া। তুমি গিয়ে শান্তারাওকে এ লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে উদ্দীপ্ত করবে।

বোরখা পরল বীরাবাঈ। অনভ্যস্ত হাতে নিজেকে ঢাকল সেই বোরখার আচ্ছাদনে। বুক কাঁপছে। মৃত্যু থেকে ফিরে নতুন জীবন কেমন দেখবে।

দরজা পার হয়ে জলসাঘরের অঙ্গন। পরে বেগম মহল। পাশ কাটিয়ে প্রধান ফটকের পথ। সে পথ ধরল বীরা।

এক চোখ থেকে আরেক চোখে একটা তীব্র কৌতূহল প্রাসাদ থেকে দুর্গে, দুর্গ থেকে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরতে লাগল। কী করে পালাল বীরাবাঈ। যে দুর্গ থেকে একটা মাছি পর্যন্ত বিনানুমতিতে বাইরে যেতে পারে না, সে দুর্গ থেকে একটা গোটা মানুষ কী করে বেরিয়ে গেল।

কী করে উধাও হয়ে গেল রাতারাতি ?

তাহলে কি দুর্গ থেকে আগেও কেউ আদিল শার বিনাহুকুমে যাতায়াত করেছে ? কেউ বা কারা ? শিবাজীর গুপ্তচর, আওরঙ্গ-জেবের সওয়ানি নিগার এই দুর্গে তার অলক্ষ্যে কতবার কত সময় প্রবেশ করে গোপন যুদ্ধ কৌশল সংগ্রহ করে পালিয়েছে, কে বলবে ?

বিরাট প্রকাশ্য ও উলঙ্গ মনে হল আদিল শার নিজেকে এবং নিজের রাজ্যকে। প্রখর আলোকে রাজা বা বাদশাকে যদি চিনে ফেলে বিদেশী রাজ্য তাহলে তাকে বিপদ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। তাকে কে কোন দিক থেকে কেমন আঘাত হানবে, তা তার কল্পনাতীত।

মহম্মদ এর জন্য দায়ী ? শুধু কি মহম্মদ ? কে জানে আর কে

কে জড়িত আছে? কিম্বা কারা বিশ্বাসঘাতক? বিশ্বাসঘাতকতার মূলোচ্ছেদ অবিলম্বে না করে দিলে, বিশ্বাসঘাতকতা প্রতি মুহূর্তে কালগ্রাস বিস্তার করবে।

বীরাবাঈএর সমস্ত দায়িত্ব মহম্মদের উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিল আদিল শা। জীবিত অথবা মৃত বীরাবাঈএর অস্তিত্বের জবাবদিহি করবে মহম্মদ।

সুলতান বলেছিল যে-সব নির্দেশ, সে-সব এত সহজে মহম্মদের ভুলে যাবার কথা নয়।

মণিমুক্তাখচিত সিংহাসনে সকালের পীত রোদ্দুর পলকে শত বর্ণ ধারণ করছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার হিমার্দ্র হাওয়া এসে দুলিয়ে দিচ্ছে পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতির তসবিরগুলি। দরবার কক্ষে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। নামাজ পাঠের দিন আজ। দরবার বসবে না। অস্থির পদচারণা করতে করতে আদিল শা এক সময় খোঁয়ারি ভাঙল। দরবার কক্ষের বাইরে অলিন্দে কামানের গায়ে বার কয় পদাঘাত করল। দু-দিক থেকে দু'জন বিরাটকায় বীভৎস চেহারার হাবসী এসে কুর্নিশ করল।

মহম্মদ!

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলল আদিল শা।

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল হাবসীরা।

কয়েকজন বাঁদী দগ্ধ কুক্কুট মাংস এবং একভাণ্ড সুরা দিয়ে গেল রৌপ্য রেকাবীতে। সাধারণত যৌবনবতী বাঁদীরা কাছে এলেই গাল টিপে দেয় সুলতান। আজ ওদের দিকে চোখ তুলে এক পলকও তাকাল না।

জাঁহাপনা!

মহম্মদ কুর্নিশ করেছে, ঝকঝকে পোশাক তার মলিন। দোমড়ানো মোচড়ানো তার মখমলের কোর্তা, আলপাকার চোস্ত। চোখের কোলে স্পষ্ট কালসিটে রেখা, মুখমণ্ডল কেঁচোর মত তেলতেলে।

আদিল বুঝতে পারল মহম্মদ পরিষ্কার জানে তাকে ডাকার কারণ। এতক্ষণ মহম্মদ বীরাবাঈকে তল্লাস করছিল, তার মধ্যে তাকে আদিল শা ডেকে পাঠিয়েছে। অসম্পূর্ণ তল্লাসের ত্রাস মহম্মদের শরীরে বেশ ছাপ রেখে যাচ্ছে ক্রমাগত।

বীরাবাঈ কোথায়?—গজদন্তনির্মিত তলোয়ারের বাঁট কঠিন মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে প্রশ্ন করল আদিল শা!

জাঁহাপনা…কথা শেষ করতে পারল না মহম্মদ।

কোথায় বীরাবাঈ? আমার কথা কি বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে?

না জাঁহাপনা। ওকে ভোর থেকে পাচ্ছি না কোথাও। মরিয়ম বাঈজী ওকে নিয়ে গিয়েছিল সেই তখন।

অন্যের ওপর দোষ চাপাবার আগে নিজের বিচার কর। তোমাকে আমি কী বলেছিলাম?

মরীয়া হয়ে বলল মহম্মদ, আমার দোষ আমি কবুল করছি বাদশা! কিন্তু আমার কথা শুনুন। আমি বীরাবাঈকে কিছুতেই নিয়ে যেতে দিচ্ছিলাম না। মরিয়ম বললে সে নিজে কৈফিয়ত দেবে আপনাকে।

তোমার গাফিলতিরও কৈফিয়ত দেবে মরিয়ম? মরিয়মের জবাবদিহি সে করবে। কিন্তু তাতে তো তোমার গাফিলতির মার্জনা হতে পারে না মহম্মদ!

মহম্মদ মাথা নীচু করে থাকল। ওর শরীর ঈষৎ কাঁপছে।

ডাক বাঈজীকে। বজ্রনির্ঘোষ যেন আদিল শার কণ্ঠে।

নীরবে স্খলিত পদশব্দে বেরিয়ে গেল মহম্মদ। তার দীর্ঘ বিশ বছরের সম্পর্ক এই বিজাপুরের সঙ্গে। সেই সম্পর্ক আজ মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত। এত দিনের প্রায় নিখুঁত বিশ্বাসের সেবা আজ অন্যের জন্য নিষ্ফল হতে চলেছে। ভয়ে এবং অভিমানে মহম্মদের চোখে জল এসে গেল।

বক্সারের যুদ্ধে মহম্মদের বাবা মারা যাবার পর কষ্টে পড়েছিল

ওর মা কচি শিশুকে নিয়ে। তখন মহম্মদের বয়স চার কি পাঁচ। আগ্রার ব্যাপারীদের গদিতে চাকরি করে দেবে বলে মহম্মদকে ওর মায়ের কাছ থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেল আক্রাম মিঞা। নিয়ে যাবার দিন কড়কড়ে এক শত রৌপ্যমুদ্রা আক্রাম মহম্মদের মায়ের হাতে গুঁজে দিয়েছিল। আর আশ্বাস দিয়েছিল যে প্রতি মাসে অর্থ প্রেরণ করবে মায়ের কাছে। মায়ের চোখের জলের ছাপে পা ফেলে মহম্মদ আক্রামের অনুসরণ করেছিল। তখন মা কিম্বা মহম্মদ কেউই তলিয়ে বুঝতে পারে নি আক্রাম মিঞার মতলব।

আগ্রার নাম শুনে নেচে উঠেছিল মহম্মদের তরুণ মন। তখন তার বয়স ষোল কি সতের। বাদশা বেগমদের দেখতে পাবে। দেখতে পাবে অশ্বারোহী গজারোহী যোদ্ধাদের। তাজমহলের কাছে যেতে পারবে। কত লোমহর্ষক আশা মহম্মদকে বিদেশ যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কিন্তু কোথায় তাকে নিয়ে গেল আক্রাম মিঞা। সে তো আগ্রা নয়। ছোট্ট অখ্যাত এক শহর। তার মত বহু ভাগ্যহীন থাকে সেখানে। কেউই অবশ্য স্থায়ীভাবে বাস করতে আসে না। অনাথ ছেলেদের কত জায়গা থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। কিছু দিনের মধ্যেই কোথায় তাদের চালান দিয়ে দেওয়া হয়, কেউ জানতে পারে না।

পরে—কয়েক দিন থাকার পরে মহম্মদ অনাথ ছেলেদের মুখ থেকেই জানতে পারল সব। একদিন মহম্মদকে দুর্গ সদৃশ পড়ো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান করা হল। জ্ঞান হল ক-দিন পরে মহম্মদ বুঝতে পারল না। কিন্তু বুঝতে পারল তাকে খোজা করা হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাটল কয়েক মাস। তার মধ্যেই তাকে আক্রাম খাঁ গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে এল বিজাপুরে। সুলতানের কাছে বিক্রী করে দিল।

সেই থেকে সুলতানের বশম্বদ কর্মচারী মহম্মদ। আক্রাম মিঞার

আমলেই মায়ের নাম উচ্চারণ করে শান্তি পাওয়ায়, বিজাপুরে এসে ভুলেও মায়ের চিন্তা করে নি মহম্মদ। খোজা হবার যন্ত্রণার চেয়ে আরও ভীষণতর যন্ত্রণা যদি কিছু থাকে মায়ের কথা ভাবলে ? সেই ভয়ে কখনো অবাধ্য হয় নি মহম্মদ। সেই ভয় আজ আবার তাকে পেয়ে বসল। আর তার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী যেন জ্বলে যেতে লাগল।

অশান্তি···ক্রমশ অশান্তি। চতুর্দিক থেকে অশান্তি যেন সঙ্কীর্ণতর ফাঁসে বেষ্টন করে আসছে। সুলতানী শাসনের শৈশব অবস্থায় স্বাধীন ভোগের এমন জটিলতা এমন অশান্তি মোটেই কল্পনা করতে পারে নি আদিল শা। তখন যৌবন। সমস্ত কিছুই যেন স্বচ্ছ মনে হত। মনে হত সহজ। ক্রমে যত বয়স বেড়েছে যতই মানুষকে দেখেছে গভীরতর, ততই স্বচ্ছতার শান্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেছে, যাচ্ছে। শাসনের লোভ মায়া সৃষ্টি করেছে বলে সুলতানী ত্যাগ করতে পারে নি। বেশ কয়েকবার ভেবেছে আদিল শা এবার সব ছেড়ে দিয়ে মক্কার পথে পাড়ি জমাবে। পারে নি।

রোদ্দুর রঙ বদলিয়েছে। এখন রোদ্দুরের রঙ একেবারে পোখরাজের মত। মহম্মদ এখনো ফেরে নি। মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। কী কৈফিয়ত দেবে মরিয়ম ?

সুলতানের চিন্তা ও পদচারণা থামল নজরদারের পায়ের শব্দে।

নজরদার যথারীতি কুর্নিশ সহকারে সুলতানের হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগল।

গতকাল শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিলে নজরদার ?

জী না জাঁহাপনা।

জোর নেশা করেছিলে ?

না জাঁহাপনা।

মজলিশ জমাচ্ছিলে কোথাও ?

জী না জাঁহাপনা।

তাহলে একটা জলজ্যান্ত মেয়েমানুষ তোমার চোখের সম্মুখ দিয়ে যেতে পারল কী করে?

কে হুজুর?—স্মরণ করতে পারছে না নজরদার।

বীরাবাঈ। জাবেলী থেকে যে মেয়েটি এসেছিল আমার দুর্গে।

হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে জাঁহাপনা। কিন্তু সে মেয়ে যে বীরাবাঈ তা আমি জানব কেমন করে? ও যে বোরখা পরে ছিল। হিন্দু মেয়ে তো বোরখা পরে না জাঁহাপনা।

প্রয়োজনে পরতে পারে সে ধারণা তোমার জন্মাল না কেন?

অচেনা বোরখা হলে সে ধারণা আমার নিশ্চয় জন্মাত হুজুর। আপনার সেবকরা অত মূর্খ নয় জাঁহাপনা।

আদিল শা হাসল এমন দুশ্চিন্তার ভিতরেও।

বলল, কার বোরখা নজরদার?

মরিয়ম বাঈজীর।

হুঁ···আদিল গম্ভীর পদক্ষেপে সিংহাসনে গিয়ে বসল। দীর্ঘকাল নিশ্চুপ বসে থাকল গালে হাত দিয়ে।

নজরদারের কাশির শব্দে চমক ক্ষুণ্ণ হল আদিল শার। ওকে চলে যেতে ইঙ্গিত করল।

আদিল শা অস্থির পায়চারী করতে লাগল আবার। কোষমুক্ত কিরীচ দিয়ে মোমনির্মিত একটি মানুষের দেহ—যাকে শত্রু ভাবা যায় অনায়াসে—বিদ্ধ করল উন্মত্ত ভাবে। বীরাবাঈ এতক্ষণ নিশ্চয় সীমান্ত পারের কাছাকাছি। ও ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। দয়িতের সঙ্গে অচিরেই মিলন সুখ উপভোগ করবে বীরাবাঈ। দয়িতের কানে নিবেদন করবে আদিল শাহের অপকীর্তি। শিবাজীর কাছে অবিলম্বে পৌঁছে যাবে বীরাবাঈএর লাঞ্ছনার খবর। বর্তমানের স্থিতাবস্থা আর রক্ষা করতে পারবে না। যুদ্ধ-শিবিরে দুর্গে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে

শান্তির সাময়িক পরিবেশ বিঘ্নিত হবে। আবার দেশজোড়া রক্তের উৎসব শুরু হবে।

সমস্ত সৈন্য শিবিরে হুঁশিয়ারি পরোয়ানা প্রেরণ করল আদিল শা। প্রধান তেরটি শিবিরে খবর দিতে তেরটি তেজীয়ান ঘোড়ার সওয়ার ছুটল। জয়সিংহ এবং দিলীর খাঁর সাহায্য ভিক্ষা করা যায় কি না, সে নিয়ে দরবারে বসল সুলতান। গোপন দরবার।

আওরঙ্গজেবের সাহায্য ভিক্ষার সুবিধে অসুবিধে—দুটো দিকই আলোচিত হল। হয়তো আওরঙ্গজেবের সবল বাহুর সাহায্যে শিবাজীকে কোণ ঠাসা করা যায়, চাই কি শিবাজীকে পৃথিবী থেকে মুছেও ফেলা যায়। কিন্তু তখন আবার আওরঙ্গজেব যদি গোটা বিজাপুরের দাসত্ব চেয়ে বসে। তাহলে কী জবাব দেবে বিজাপুর!

গোপন দরবার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। আগামী কালের জন্য মুলতবী থাকল দরবার।

একেক সময় আদিল তার আশেপাশের লোকগুলিকে চিনতে পারে না। মনে ধাঁধা আসে। কে শত্রু কে মিত্র, সন্দেহ জাগে। আবার ভাবে মানুষ বিচিত্র বলেই সকলের মতামত বিভিন্ন। শত্রু ভাবার কোনো পর্যাপ্ত কারণ নেই।

রাত্রির ক্ষণকাল পরেই আদিল শা পার হল বসরাই গোলাপের বাগিচা। একটা গোলাপ ছিঁড়ে নিল হাতে। খুশবাই নিতে লাগল নাকের কাছে বারবার তুলে।

মরিয়মের সঙ্গে যে সম্পর্ক এত দিন ধরে গড়ে উঠেছে, আজ তারও নতুন করে বিচার করতে হবে। স্নেহ মায়া মমতা ভালোবাসার আওতা থেকে দূরে নিক্ষেপ করতে হবে মরিয়মকে। তবেই বিচারের অনুকূল হাওয়া তৈরি করতে পারবে। কিন্তু তা কি সম্ভব? পারবে সুলতান মরিয়মকে দূরে ফেলে বিচার করতে?

বিশ্বাসঘাতকতার চিন্তা করে আদিল শা মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে মনে মনে। তখন মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে শেষ করে দেবে

মরিয়মকে। আবার কিছুক্ষণ পরে নানারকম যুক্তি এনে মরিয়মের অপরাধের সাফাই গাইছে মন।

খানিকটা এগোতেই আদিল শাহের সামনে যেন হঠাৎ ভেসে উঠল রংমহল। চিন্তার অন্ধকারে দুনিয়ার অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল আদিল শা।

রংমহলের প্রধান দরজায় ডান কাঁধ হেলান দিয়ে প্রতীক্ষা করছে মরিয়ম। পরনে নৃত্যের পোষাক। পেছনে নাচঘরের আলোর পটভূমিতে নারী দেহের চিত্র অপূর্ব ছায়াময়।

মুহূর্তে আদিল শার মন হালকা হয়ে গেল। দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা সব উপে গেল। মনের মধ্যে হাজারবাতি ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠল।

সসম্ভ্রমে কুর্নিশ করেই সুলতানের হাত ধরল মরিয়ম। ওকে দেখে কে বলবে শয়তানের সামান্য প্রভাব থাকতে পারে ওর শরীরে? কে বলবে এই মেয়ে পৃথিবীর কোনো জীবের ক্ষতি চিন্তা করতে পারে বা ক্ষতি সাধন করতে পারে?

ধীর কণ্ঠে সুলতান বলল, কেমন আছ মরিয়ম। দেমাক বহাল আছে তো?

আপনার মেহেরবানীতে সব ভালো আছে জাঁহাপনা।

আদিল শা সুস্থির হয়ে বসতে পারছে না আজ। মরিয়মের কথার কোনো জবাব না দিয়ে বা কোনো কথার সূত্র না সৃষ্টি করে প্রশস্ত নাচঘরে পায়চারী করতে লাগল চৌকোণভাবে। মরিয়ম আদিল শার বাঁ হাত ধরেই আছে তার ডান হাত দিয়ে।

মরিয়ম বুঝতে পারল আদিল শার চিত্ত-চাঞ্চল্য। নানান মধুর কথায় আদিল শার মনকে দুশ্চিন্তার ব্যূহ থেকে উদ্ধার করতে চাইল।

আদিল শা হঠাৎ থামল অর্জুন প্রসাদের সামনে।

বলল, আপনার কপালে আজ মাটির তিলক দেখছি না কেন অর্জুন প্রসাদ?

অর্জুন প্রসাদ বলল, গঙ্গামাটি ফুরিয়ে গেছে জাঁহাপনা।

যাক। আমি ভাবলাম কেউ বুঝি বারণ করেছে।

না জাঁহাপনা। আপনার রাজত্বে হিন্দুয়ানীর কোনো বিঘ্ন ঘটাতে কেউ সাহস পায় না।

আদিল যেন নিজের মনে বলল, চেষ্টা তো আমি করি, নজর তো রেখেছি।

আদিল শা সিংহাসনে এক পা তুলে দাঁড়াল।

বলল আবার, আপনি গঙ্গামাটি আনিয়ে নিন। রোজ আপনার কপালে গঙ্গামাটি দেখে দেখে লোকে একটা অভ্যাস গড়ে তুলেছে। হঠাৎ না দেখলে নানারকম ভাববে, নানা গুজব তৈরী করবে। এখন রাজ্যে সামান্য বিদ্বেষ জন্মাতে দিতে চাই না। শত্রুরা এই চাইছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিজাপুরকে ঠেলে দিতে পারলে বিজাপুরের বুকে হাঁটু গেড়ে বসতে অসুবিধে হবে না।

আনাবার চেষ্টা করেছিলাম জাঁহাপনা। লোক পাচ্ছি না।

লোকের কী হবে! নিজে আনতে পারেন না?

তাহলে তো আমাকে মাস খানেকের ছুটি নিতে হয়।

সামান্য গঙ্গামাটির তিলক পরবার জন্য মাস খানেকের ছুটি! কী বলছেন আপনি! বাজারে যাতায়াত করতে মাসখানেক সময় লাগে নাকি?

বাজারে গঙ্গামাটি পাওয়া যায় না হুজুর। যদিও ক্বচিৎ মেলে তো সেই দামে গরীবরা কিনতে পারে না। উত্তরভারতে গিয়ে গঙ্গা থেকে মাটি আনতে হবে।

এত কাণ্ড! ঠিক আছে আপনি বলে দেবেন। আওরঙ্গজেবের দরবারে কালকেই আমার দূত যাচ্ছে। আর যখনই আওরঙ্গজেবের দরবারে এখান থেকে কেউ যাবে খেয়াল রাখবেন। ধর্ম কর্ম করতে এত গোবেচারা হলে চলে!

আদিল শাহের নজর পড়ল এবার সারেঙ্গীয়ার মুখে। নতুন সারেঙ্গীয়া। মাস তিনেক থেকে কাজে লেগেছে। লোকটার হাত

যশ আছে। নইলে মরিয়ম এতদিন ওকে সঙ্গত করতে দিত না। নাচের তালে বাজাতে না পারলে মরিয়ম ক্ষমা করে না কাউকে।

সারেঙ্গীয়াকে প্রশ্ন করল আদিল শা, বিজাপুর কেমন লাগছে রসুল মিঞা!

রসুল মিঞা কৃতার্থ হওয়ার হাসিতে বলল, খুব ভালো জাঁহাপনা।

তলবে খুশী তো?

একটু বেশি হলে ভালো হত জাঁহাপনা। আমি দিল্লিতে আরও বেশি তলব পেতাম।

পলকের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াল আদিল শা। মরিয়মের উদ্দেশে বলল গম্ভীর স্বরে, এ খবর আমাকে জানাও নি কেন মরিয়ম?

আপনি তো ওকে বহাল করেন নি হুজুর। আপনার আমীর বহাল করেছে। বোধহয় জাঁহাপনার তহবিলের সাশ্রয় করতে চেয়েছে আমীর সাহাব।

যোগ্যতার যথাযথ মূল্য দিতে হবে তো? আচ্ছা আমি দেখছি।

মরিয়ম আজ সুলতানের খুঁটিনাটির প্রতি লক্ষ্য দেখে বেশ আশ্চর্য হল। রাজ্যশাসনে যে লোকটা চিরকাল মাথা ঘামিয়ে এসেছে তাকে প্রজাদের সামান্য সুখ সুবিধার জন্য চিন্তিত দেখে মরিয়ম বুঝল যে একটা বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে চলেছে সুলতান। রাজ্যের গাঁথুনি প্রতিটি সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, এই জ্ঞান উন্মেষলাভ করছে সুলতানের মনে। হয়তো এর পর থেকে রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারবে সুলতান।

সাধারণ মানুষের সুখে দুঃখে রাজা পাশে থাকলে, রাজার সুখে-দুঃখেও সাধারণ মানুষ জীবনপাত করতে দ্বিধা করবে না···এই সত্য সুলতান এতকাল বাদেও উপলব্ধি করতে চলেছে দেখে মরিয়ম আনন্দে উদ্বেলিত হল।

বলল, এবার তাহলে শুরু করি জাঁহাপনা।

শুরু করবে? কিন্তু প্রাণ ঢেলে নাচতে ও গাইতে পারবে তো?—আদিল শাহের গলার স্বরে নির্মমতা!

এ প্রশ্ন কেন জাঁহাপনা!

আমার প্রশ্নের জবাব আগে দাও, তারপর তোমার জবাব দেব।

আমার অসুস্থতা আজ আর নেই জাঁহাপনা।

অসুখের জন্য কি তোমার প্রাণ মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে? না অন্য কোনো কারণে?

কোনো কারণেই আমার প্রাণমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে না জাঁহাপনা। আজকে আপনাকে একটু অন্য রকম দেখছি কেন হুজুর? আপনি আজ যেন আমার প্রতি খুশী নন।

ঠিক ধরেছ বুদ্ধিমতী!

আদিল শা হঠাৎ ইশারা করল যন্ত্রবাদকের দলকে চলে যেতে। ওরা ওদের যন্ত্রগুলি গুছিয়ে রেখে একে একে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মরিয়মের বুকে কাঁপুনি জাগল। দেহের লাস্য কঠোর হয়ে যেতে চাইল। কিন্তু লাস্য ক্ষুণ্ণ হতে দিলে চলবে না। সুনিপুণ প্রয়াসে নিজেকে সহজ করল মরিয়ম। কয়েকবার নৃত্যরত ভঙ্গিতে অশ্রুত বাদ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জলসামহলে চক্র কাটল।

যৌবনের মায়াজাল বিছিয়ে দিতে লাগল বিরাট প্রকোষ্ঠটিতে। একবার আদিল শাহের শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে, একবার চলে যাচ্ছে দূরে।

বীরাবাঈ কোথায়?

হঠাৎ নাচ থামাল মরিয়ম। চোখে মুখে ওর বিস্ময় ফেটে পড়ছে। বলল, তার আমি কী জানি বাদশা!

জান না?

না জাঁহাপনা।

তোমার বোরখা ও পেল কী করে?

ও তো রাত্রে আমার ঘরে ছিল। ঘর থেকে আমার ঘুমন্ত অবস্থায় বোরখা নেওয়া অসম্ভব না।

কেন তোমার ঘরে ছিল? আর ঘর থেকে গেলই বা কোথায়? গেল তো তুমি জানতে পারলে না? এই বা কেমন ব্যাপার?

আদিল শা বেশ উত্তেজিত। সুরার ভাণ্ড থেকে সোজা গলায় কিছু সুরা ঢেলে দিল।

আমার ঘরে ওকে নিয়ে না গেলে যে ও মরে যেত হুজুর। আমি তো আর সারা রাত জেগে থাকি নি। সকালে উঠে ওকে দেখতে পাই নি। ভেবেছি বোধহয় ও নিজের মহলে চলে গেছে।—বলতে বলতে সুলতানের কাছে গিয়ে এক পাত্র সুরা হাতে তুলে দিল মরিয়ম, সত্যিই বীরাবাঈকে পাওয়া যাচ্ছে না বাদশা?

তুমি জান না? শোন নি?

শুনলে কি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব হুজুর!

কেন তুমি মহম্মদের হেফাজত থেকে বীরাবাঈকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে? কেন তুমি আমার ওপর খোদকারি করেছ? তোমার আস্পর্ধা দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে মরিয়ম।

আদিল শাহের কোলে মাথা গুঁজে কাঁদতে শুরু করল মরিয়ম। ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল। বহুক্ষণ কোনো জবাব দিল না।

আদিল শার সুর নরম হয়ে গেল, বলল, আমার কথার উত্তর দাও।

জলভরা চোখ দুটি চুণীর মত উজ্জ্বল করে মরিয়ম আদিল শার দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে দু'হাতে সে আদিল শার গলা জড়িয়ে ধরল।

আর্ত কণ্ঠে বলল তারপর, আমাকে আপনি ফাঁসিতে দিন জাঁহাপনা। আপনি আমাকে ফাঁসীতে না দিলে আমি নিজে গলায় দড়ি দেব। যে মুহূর্তে আপনি আমায় অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন সেই মুহূর্তে আমার মৃত্যু ঘটে গেছে। এত বছর ধরে আপনার অনুগ্রহে আমার দেহে রক্ত বইছে, আপনার ভালোবাসার বাগিচায় আমি রূপ বিতরণ করছি, এত বছর ধরে একমাত্র আপনি ছাড়া আর দ্বিতীয় পুরুষের মনোরঞ্জন আমি করি নি। সে সব আমার ব্যর্থ হয়ে গেছে।

তুমি তো আমার বেগম হলে না বাঈজী।

বেগম হই নি বলে কি আমি বিশ্বাসঘাতিনী হব? আপনি দেখেছেন হুজুর আপনি ছাড়া আর কারুর জন্যে আমি নিজেকে দিচ্ছি?

আদিল শা নিশ্চুপ।

মনের মধ্যে উদ্দামতা শান্ত হয়ে আসছে। সুরার স্রোতও বাড়ছে দেহে। মরিয়মকে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অনুভব করল আদিল শা, এ নারী কখনোই বিশ্বাসঘাতিনী হতে পারে না।

হঠাৎ দুর্গ পরিখার ওপারে একপাল শেয়াল ডাকতেই আদিল শা উঠে দাঁড়াল। দ্বিপ্রহর রাত্রির ঘোষণা করছে শেয়ালরা। কিছু দিন যাবত মিনারে উঠে নিশীথে এক পাক ঘুরে আসছে সুলতান। সাবধানতা অনেক সময় অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার করে।

মরিয়মকে এক হাতে ধরে সুলতান বলল, চল। এখানে আজ আর ভালো লাগছে না।

মরিয়ম নীরবে অনুসরণ করল আদিল শাকে।

যেতে যেতে বলল, আমার একটা অনুরোধ আছে জাঁহাপনা।

বল।

মনে মনে মরিয়ম তার আবেদন গুছোতে শুরু করল।

দু জনে মিনারের ঘূর্ণ্যমান সিঁড়ি ভাঙছে। মোড়ে মোড়ে মশালের আলো হাওয়ায় কাঁপছে। মশালের আলো সরু মিনারের সিঁড়িগুলিকে যেন অন্ধকার করেছে বেশি। গুমোট গরমে ঘামছে দুজনে। ফোকরের হাওয়া খুবই অপর্যাপ্ত।

সুলতান কয়েকবার প্রশ্নার্ত চোখে তাকাল আলিঙ্গনাবদ্ধ মরিয়মের দিকে।

মিনারের শীর্ষদেশে এসে পৌঁছতেই সিঁড়িতে তৃতীয় ব্যক্তির দ্রুত পদক্ষেপ শোনা গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল এক খোজা।

তখন হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছিল মরিয়মের ঘাঘরা, সুলতানের কোর্তা।

কে? আদিল শা আগন্তুককে প্রশ্ন করল।

রসুল জাঁহাপনা। কুর্নিশ ঠুকে বলল আগন্তুক।

পরিন্দা শিবির থেকে যুদ্ধের খবর নিয়ে দূত এসেছে জাঁহাপনা। জাঁহাপনা কি এখন তার সঙ্গে দেখা করবেন, না কাল সকালে দরবারে তাকে আসতে বলব?

কিছু সংবাদ বলেছে সে কি?

বলেছে হুজুর। সাতপুরা পর্বতের নীচে মাওলা সৈন্যরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছে। গতকাল রাত্রে যুদ্ধ হয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা পাঁচ কোশ পেছু হটে এসেছে।

তারার আলোয় যতটুকু দেখা যাচ্ছিল তাতেই বুঝল মরিয়ম আদিল শার মুখে ত্রাসের ছায়া জমেছে।

রসুলকে বলল আদিল শাহ, তুমি যাও। কাল সকালে ওকে দেখা করতে বল।

রসুল চলে গেল। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

মিনারে দাঁড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায় বৃত্তভাবে। ধীরে ধীরে ঘুরে আদিল শা দেখল দিগন্ত পর্যন্ত। কিন্তু এখন অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা গেল না।

মরিয়ম বলল, রসুল তো কালকের খবর বলল জাঁহাপনা। আজকের খবর হয়তো আমাদের পক্ষে শুভ হতে পারে।

যে দিনটা কেটে যাচ্ছে সেই দিনটাই যেন শুভ মরিয়ম।

অত মুষড়ে পড়লে চলবে কেন জাঁহাপনা? বিজাপুর তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গত কয়েক মাস ধরে মজবুত করেছে। সহজেই কি যুদ্ধের জয়পরাজয় নিরূপিত হয়ে যাবে?

সুলতান কোনো জবাব দিল না।

ফৌজদারের হুঁশিয়ার দিক দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলল। তোরণে

তোরণে নজরদারদের ত্রস্ত প্রহরা। আকাশের অন্ধকার চিরে ছিটকে পড়ল স্খলিত নক্ষত্র। হিমেল হাওয়ায় মিনারের চূড়াদেশে শীতলতা জমছে।

তুমি কী বলছিলে বাঈজী?

নানান কারণে আপনার সন্দেহের পাত্রী হয়ে যাচ্ছি আমি। কাছে থাকলে ঘটনাচক্রে এই সন্দেহ বাড়বে বই কমবে না। সন্দেহ এমন জিনিস, একবার জন্মালে আমরণ তার উপশম নেই। তাই সব দিক ভেবে আমি দূরে চলে যেতে চাই। আপনার জীবনের এলাকায় না থাকলে, আপনার অস্তিত্বের বাইরে থাকলে কোনো ব্যাপারেই আমার হস্তক্ষেপ কিম্বা চিন্তাক্ষেপ সম্ভব নয়। তাতে আপনি আমার দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। জাঁহাপনা ওই যে পাহাড়ের চূড়া আকাশের অন্তরে বসে রয়েছে সেইখানে আমার জন্য একটা ছোট্ট বাসস্থান করে দিন।

দুঃসময়ের আশঙ্কা ঘনিয়ে আসছে চতুর্দিক থেকে। এই সময়ে তুমিও চলে যাবে মরিয়ম?—আদিল শার কণ্ঠ বিশ্বাসী প্রণয়ীর মত।

চলে যাব না বাদশা। দূরে যাব। যখন প্রয়োজন পড়বে এই মিনারের শীর্ষদেশ থেকে ডাকবেন আমি চলে আসব।

এত দূরের ডাক ওখানে পৌঁছবে?

সঙ্কেত করবেন।

আদিল শা কিছুক্ষণ নীরব থাকল। তারপর বলল, বেশ। তাই হবে।

আদিল শাহকে জড়িয়ে ধরল মরিয়ম। কিন্তু আদিল শা নিস্পৃহ নিরুত্তেজিত।

শ্বেত পাথরের স্তূপ আসছে মোষের গাড়িতে সারি সারি। পাথরগুলিকে চৌকোণ ত্রিকোণ পাঁচকোণ আকারে মসৃণ করছে স্থপতির

রাজমিস্ত্রিরা। কষ্টিপাথরের গাঁথুনির উপরে বাইরে শ্বেত-পাথরের সুদৃশ্য খণ্ডগুলি বসিয়ে রচনা করে চলেছে মরিয়ম বাঈএর স্বপ্ন।

দিনের পর দিন একটা সাদা ঘোড়ার ওপর চড়ে কালো বোরখা পরে দেখতে যায় মরিয়ম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকে। ঘুরে ফিরে দেখে। অপছন্দের কিছু ঘটলে বারণ করবে ভাবে। কিন্তু স্থপতি অভিযোগের কোনো ফাঁক রাখে না।

তরুণ যুবক স্থপতি। রোজ মরিয়মকে দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আর তার কাজ করে চলে। নিজে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে শ্বেতপাথর কোঁদাই করে। নির্দেশ দেয় তার সহচরদের।

মরিয়ম প্রায় ভাবে ওকে জিজ্ঞেস করবে, কেন সে তাকে দেখে অমন অভদ্রভাবে। একদিন মরিয়ম বেশ অস্বস্তি বোধ করল স্থপতির তীক্ষ্ণ নজরে।

সেদিন আর থাকতে না পেরে বিকেলের রক্তরৌদ্র বোরখায় মেখে এগিয়ে গেল স্থপতির নিকটে।

বলল, শুনুন।

যুবক বিস্ময়ান্বিত চোখে বলল, আমায় বলছেন?

হ্যাঁ, আপনাকে বলছি।

সাদা ঘোড়ার ওপরে মরিয়ম। কালো বোরখা। চোখ দুটি কেবল দুটি আলোর উৎসের মত জ্বলজ্বল করছে।

রোজ আমায় অমন করে কী দেখেন বলুন তো? সোজাসুজি স্পষ্ট নির্মম গলায় প্রশ্ন করল মরিয়ম।

মোটেই অপ্রস্তুত হল না স্থপতি।

বলল, আপনি কি তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

অবশ্যই। যে কেউ এতে অসন্তুষ্ট হবে।

আপনাকে চিরস্থায়ী সন্তুষ্ট করতে যদি সাময়িক অসন্তুষ্ট করে থাকি, মাপ করবেন বাঈজী সাহেবা।

অর্থাৎ?

ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল মরিয়ম।

আসুন না, দেখুন কোথায় কেমন হল।—বলল স্থপতি।

আমি সব দেখেছি।

কেমন লাগছে।

নিন্দে করার কিছু নেই এখন পর্যন্ত।

ভবিষ্যতেও আশা করি কিছু পাবেন না।

আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো। গর্ব নয়।

সরবত চলবে?

না। আমি মাঠে ঘাটে কিছু খাই না।

এটা তো আর মাঠঘাট নয় বাঈজী সাহেবা, আপনারই বাড়ি।

এখন পর্যন্ত মাঠঘাট বই কি। যাক্ গে, আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব এখনো পাই নি।

আপনি কি বিশ্বাস করবেন?

বিশ্বাসযোগ্য হলে করব।

আপনার বাড়ি যাতে আপনারই লাবণ্য পায়, তার তুলনা করি আপনাকে দেখে।

কী আজগুবি কথা বলছেন? মরিয়ম এবার ধমকের সুরে বলল।

বললাম তো বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না।

বাড়িতে কখনো মানুষের লাবণ্য আরোপ করা যায়?

শেষ হলে দেখবেন। বাড়িটা যদি আপনার লাবণ্যকে স্মরণ করাতে না পারে তাহলে আমায় যা-ইচ্ছে শাস্তি দেবেন।

হঠাৎ মরিয়মের মনে পড়ল, বলল, কিন্তু আমার বোরখা তো কাচের মত স্বচ্ছ নয়···

আমার নাম পল্বল নায়ক। না স্বচ্ছ নয়। তা ছাড়া আমার তৃতীয় নয়ন নেই। আপনাকে দেখেছি বাঈজী সাহেবা। যে দিন এক মারাঠাকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, সেদিন আমার বোরখা ছিল না। কিন্তু এক দিন দেখেই আপনার হয়ে গেছে তো আর দেখেন কেন।

স্মৃতিকে ঝালাই করে নিতে দরকার পড়ে।

আদিল শা নিজে এসে তারপর যে দিন গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল সে দিন আর কেউ না জানুক, আর কেউ না বুঝুক, মরিয়ম বুঝেছিল যে, সত্যি সত্যি তার রূপের লাবণ্য মেখে দাঁড়িয়ে আছে বাঈজীমঞ্জিল।

অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গিয়েছিল তার দেহে। মানুষের দেহের লাবণ্য মর্মর প্রাসাদ কী করে পেতে পারে ভেবে কূল পায় নি মরিয়ম।

বাঈজীমঞ্জিল বিরাট বড়। অন্তত এক জন মাত্র লোকের পক্ষে বেশি বড় তো বটেই। আট দশ জন খোজা বাঁদীতেও যেন ভরতে চায় না, জমজমাট হতে চায় না বাড়িটা। এখানে এসে মরিয়মের খুব একা মনে হতে লাগল।

কেন সে সহসা সুলতানের দুর্গ থেকে সরে এল? কেন সে দেশসেবা থেকে সরে এল? কেন তার মনে ঢুকল যে সে দেশসেবার নামে বিশ্বাসঘাতকতা করছে? এ সব প্রশ্নের উত্তর মরিয়ম খুঁজে পেল না।

এ পৃথিবীতে কারুর উপকার, কারুর সেবা করতে হলে কারুর না কারুর অপকার বা ক্ষতি করতেই হবে। আর আদর্শের জন্য লড়াই করতে গিয়ে, অনাদর্শের মূলোচ্ছেদ করতে গিয়ে হিংসা করছি, এই মনোভাব আসা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

যুক্তিযুক্ত যদি নয় তবে কেন লোকালয় থেকে নির্জনবাসিনী হল মরিয়ম?

বিপদের সম্ভাবনায়?

সুলতানের প্রতি মায়ায়?

ঝঞ্ঝাটঝামেলায় দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিতে আর পারছে না বলে?

দেশপ্রীতির নামে যে সব কাজ করল তার কী ফল সে ভোগ করল ভেবে?

সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে আশ্চর্যের।

এখানে আসার পর সুলতান এক দিন মাত্র এসেছিল। আর আসতে পারে নি। অন্য কোন কারণে নয়—রাজকার্যে ব্যস্ততার জন্য। সুলতান এখানে এসে পুরো এক দিন এক রাত্রি ছিল। সে দিন সারা পৃথিবী থেকে দূরের নির্জনবাস মনে হয়েছিল মরিয়মের।

চারিদিকে পাহাড়। বনভূমি। হঠাৎ তার মাঝখানে একটি শ্বেতপাথরের বাড়ি। অনেকটা প্রকৃতির অনেকটা সভ্যতার দান। নির্জনবাস বৈকি।

সুলতানের থাকা মানে সেই পুরনো আবেদন আর নিবেদনের পর্ব। কেবল দেহের প্রতি লোভ দেখলে গা ঘৃণায় শিরশির করে তার। সেই সারা দিন মরিময় যেন সজারু হয়ে ছিল।

রোজ বিকেলে সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর অভ্যাস করে ফেলেছে। আজও বেড়াতে যাবে। খোজা রোজ বলে সঙ্গে প্রহরী নিয়ে যেতে। কখন কোথেকে কেমন বিপদ আসে কে বলতে পারে।

কিন্তু মরিয়ম রোজ খোজার কথায় কর্ণপাত না করে একা বেরোয় সাদা ঘোড়াটার পিঠে চেপে।

সেগুনবনের কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামাল মরিয়ম। সিংহের গর্জন শোনা যাচ্ছে দূরের ঘন অরণ্যে। কোমরে ঝোলান বন্দুকটা চর্মনির্মোক থেকে খুলে কার্তুজ পুরে প্রস্তুত হল মরিয়ম।

সন্ধ্যে হতে তখন মাত্র এক ঘণ্টা দেরী।

বিজাপুর দুর্গের দিক থেকে এক দ্রুত ধাবমান ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কয়েক মিনিট পরে অশ্বারোহীকে দেখা গেল। চিনতেও পারা গেল। রণদুল্লা খাঁ।

ও আবার এখানে কেন। এদিকে ওর কোন কাজ থাকতে পারে বলে তো মনে হয় না। এ পথে একমাত্র বাঈজীমঞ্জিলেই যাওয়া যায়। তবে কি বাঈজীমঞ্জিলের উদ্দেশেই রণতুল্লা খাঁ ঘোড়া ছুটিয়েছে?

আবার স্নায়ুমণ্ডলীতে বীভৎস কম্পন অনুভব করল মরিয়ম। নির্জনতার অপব্যবহার এমন ভাবে হতে পারে আগে তার মাথাতেই আসে নি বলে নিজেকে গালাগাল দিল।

রণতুল্লা খাঁর গাঢ় পিঙ্গল ঘোড়াটি এসে থামল একেবারে মরিয়মের সাদা ঘোড়াটির পাশে। পিঙ্গল ঘোড়াটির শরীর ঘামে চিকচিক করছে। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে মাটিতে।

সেলাম আলেকুম বাঈজী সাহেবা।—সব কটা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল রণতুল্লা।

মরিয়ম বলল, আলেকুম সেলাম।

এত গম্ভীর কেন? মনে হচ্ছে আমাকে দেখে খুশী হও নি মরিয়ম?

ঘোড়া থেকে নামল রণতুল্লা।

খুশী না হওয়ার কী আছে?

সে উত্তর তো তুমি দেবে। নেমে এস—ঘোড়ায় বসে কি মেহমানের সঙ্গে সহবত করবে? বিশেষ, মেহমান যখন মাটির উপর দাঁড়িয়ে।

মরিয়ম দেখল সোজাসুজি পন্থায় একে বাগ মানাতে পারবে না। বুদ্ধি প্রয়োগ করে এর হাত থেকে উদ্ধার পেতে হবে।

এক লাফে ঘোড়া থেকে নামল মরিয়ম।

হয়েছে? এবার সহবত ঠিক হয়েছে খাঁ সাহেব?

মৃদু মৃদু হাসছে মরিয়ম। মুখে অস্পষ্ট ভয়ের ছাপ মাঝে মাঝে ফুটে উঠছে সিংহ গর্জন শোনার ফলে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দূরের অরণ্যে।

কী দেখছ মরিয়ম?—রণদুল্লা খাঁর নজর এড়ায় নি মরিয়মের ভাবান্তর।

সিংহ কি বাঘ গর্জন করছিল বনের ভিতর আর তার কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখলাম একটা ফেউকে। নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও বাঘ লুকিয়ে আছে।

রণদুল্লা মরিয়মের শ্লেষ ধরতে পারল না। তাকে এতটা অপদস্থ করবে আশাই করতে পারে না রণদুল্লা।

কোথায় ফেউ?

খুব কাছেই আছে। মাঝে মাঝে কথা বলছে। আপনি শুনতে পাচ্ছেন না খাঁ সাহেব?

কই না তো! চল, বাঈজীমঞ্জিলে যাই। তুমি এখানে কী করছিলে মরিয়ম।

বেড়াচ্ছিলাম। আপনি সামান্য একটা বাঘের ডাক শুনে ভয়ে পালাতে চান খাঁ সাহেব? শিবাজীর সামনে পড়লে তো সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলাভ করবেন দেখছি।

রাখ তোমার শিবাজী। হিন্দুস্তানে এক শের ছিল শেরশাহ, তারপর—বুকে চাপড় মারল রণদুল্লা—এই শের রণদুল্লা খাঁ। চুহাকে ডরাবে শের?

ও বুঝেছি। জঙ্গলের শেরকে দেখে ডরাবে বিজাপুরের শের। কিন্তু মানুষকে দেখে ডরাবে না।

মরিময় সশস্ত্র বন্দুকটি হাতে ধরে আছে। মাঝে মাঝে এ দিক সে দিক লক্ষ্য করছে বন্দুকের নল তুলে।

কাছে গিয়ে পিঠে হাত রাখল রণদুল্লা। বন্দুকের নলটা রণদুল্লার পাঁজরে ঠেকাল মরিয়ম। বর্মে ঠেকে নলের ধাতব শব্দ হল।

তোমার জন্য আমি আর থাকতে পারছি না মরিয়ম।

কী অপরাধ করলাম আপনার কাছে?

বোরখার শিরাচ্ছাদন খুলে ফেলেছিল মরিয়ম। ওর গালে

ডান হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে সুড়সুড়ি দিল খাঁ সাহেব। চূর্ণ চুলগুলি ঠিক করে দিল।

তুমি কেন অপরাধ করবে? তোমায় ভালোবেসে অপরাধ তো আমি করেছি—যার শাস্তি তুমি বারবার দিয়ে আসছ।

দুনিয়াতে ভালোবাসার আর কোনো মেয়ে খুঁজে পাচ্ছেন না?

তোমায় তো সুলতান ভালোবাসে না। যদি জানতাম যে সুলতান তোমায় ভালোবাসে তাহলে তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতাম।

আহা! কী বীর আপনি। সুলতান যে আমায় ভালোবাসে না সে কথা কী করে জানলেন?

নইলে তোমাকে নির্বাসন দেয়?

এ নির্বাসন তো সুলতান দেয় নি। এ আমার স্বেচ্ছা-নির্বাসন।

তুমি জানো না বাঈজী যে সুলতান তোমাকে জেনে ফেলেছে?

কী জেনে ফেলেছে।

তুমি শিবাজীর দিকে।

কে বললে? সব মিথ্যে কথা আপনার।

যাই হোক, তোমাকে আর কোনো কৈফিয়ত সুলতানকে দিতে হবে না।

কাকে দিতে হবে? আপনাকে?

হ্যাঁ। তুমি যদি আমার কথা শোন তাহলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে না। আর যদি আমার কথা না শোন তাহলে তোমাকে মরতে হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। সোজা কথা বলে দিলাম। কোনটা তুমি বেছে নিতে চাও।

খাঁ সাহেব, এই নির্জন পাহাড়ে একা একটি মেয়েকে শাসানো খুব সহজ। একে বীরত্ব বলে না। চরিত্রহীন বা বিলাসী হওয়া বীরত্বের নয়, যদিও অনেকে বড় করে জাহির করে আত্মসুখ পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে

শত্রুর আক্রমণ বিধ্বস্ত করার নাম বীরত্ব। আমি আপনাকে একজন বিখ্যাত বীর বলেই জানতাম।

মানে তুমি আমার কথা শুনবে না?

আপনার কোন কথা শুনি নি খাঁ সাহেব?

ন্যাকামি বাদ দাও। কাল যখন বিজাপুরের সিংহাসনে আমি বসব তখন কী করবে মরিয়ম?

সে তো বহুদিন ধরে শুনছি আপনার এই আস্ফালন।

মরিয়ম এ আমার আস্ফালন নয়! কী করে তোমায় এখন বোঝাব যে বিজাপুরের ভাগ্য খুব শীঘ্রই বদলে যাচ্ছে। সব কথা তো আর তোমাকে এখন বলা যায় না। কেন তুমি তোমার ভবিষ্যত নষ্ট করছ?

মানে?

তোমাকে আমি প্রধানা বেগম করব।

খিলখিল মেয়েলি হাসি বনে বনান্তরে পাহাড়ে সানুদেশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

মরিয়ম গড়িয়ে পড়ল যেন। হাসির দমক রণদুল্লা খাঁকে উত্তেজিত করল। নারীদেহটির আসঙ্গলিপ্সায় আকুল হয়ে উঠল সে। মরিয়মকে জড়িয়ে ধরল রণদুল্লা। ওর বাহুবেষ্টনে ছটফট করতে লাগল মরিয়ম। তার মধ্যেই চুম্বন এঁকে দিল রণদুল্লা খাঁ।

খাঁ সাহেব—মরিয়মের চোখে পশ্চিমাকাশের লাল আভা—মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার জীবনের চিন্তায় আমাকে শাসানোর আগে নিজের জীবনের চিন্তা করুন।

বন্দুকের নল রণদুল্লা খাঁর বুকের সোজা।

কী, কী হচ্ছে! সব সময় এমন রঙ্গ ভালো না।

রঙ্গ? আপনার সঙ্গে রঙ্গ কীসের? বরং আপনি অযোগ্য স্থানে রঙ্গ করছেন। আমাকে বেগম করবেন বলাটা আমার কাছে রঙ্গ ঠেকছে।

কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রণতুল্লা। বন্দুক এখনো তাকে তাক করে'।

সত্যি বলছি বাঈজী, তোমাকে আমি প্রধানা বেগম করব। খোদার নামে কসম খেয়ে আমি বলছি।

আদিল শা অনেকবার আমায় তার বেগম করবে বলেছে! বেগম হবার ইচ্ছে থাকলে কবে বেগম হয়ে যেতে পারতাম।

রণতুল্লা এবার দমে গেল। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, কেন বেগম হলে না?

সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তাহলে আমি যাই। তোমার বন্দুক নামাও মরিয়ম।

আর কখনো আমাকে বিরক্ত করতে আসবেন না বলুন?

না। আসব না।—বিড়বিড় করল রণতুল্লা।

দীর্ঘকায় পাঠানের বলিষ্ঠ দেহ যেন শিশুর মত মনে হল মরিয়মের। আঘাতের কাছে সবাই নত। বন্দুকটা আস্তে আস্তে নামাল।

পিঙ্গল ঘোড়াটির দিকে তাকাল রণতুল্লা। মরিয়মের সাদা ঘোড়াটির গা চেটে দিচ্ছে পিঙ্গল ঘোড়াটি। এগিয়ে গেল রণতুল্লা তার ঘোড়ার দিকে।

বলল, চল মরিয়ম, সন্ধ্যে হয়ে আসছে। তোমায় বাঈজীমঞ্জিল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

অশেষ ধন্য হলাম আপনার কৃপা দেখে। আমি একাই যেতে পারব এই ভরসাতে বেরিয়েছি।

সাদা ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে মরিয়ম আদর করল। মরিয়মকে এক নজরে দেখছে রণতুল্লা।

মরিয়ম রেকাবে পা দিয়েছে···এবার এক লাফে উঠে পড়বে। তার আগেই রণতুল্লা তাকে খপ করে ধরে ফেলল। আচমকা কেড়ে নিল তার বন্দুক। ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। জাপটে ধরল মরিয়মকে। ওর কালো বোরখা এক ঝটকায় খুলে ফেলে দিল মাটিতে।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল এক লহমায়।

তারপর ওরা দুজনে ঘাসের ওপর পড়ল। ধস্তাধস্তি করার চেষ্টা করল মরিয়ম। কিন্তু ওই দৈত্যটার সঙ্গে জোরে এঁটে উঠবে কেন।

মরিয়মের বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে চেপে বসেছে রণতুল্লা আর ওকে অজস্র চুম্বনে বিব্রত করে চলেছে। পাশবিক আচরণে রণতুল্লা ক্ষিপ্র হবার চেষ্টা করছে।

বলল, এবার বাঈজী? আমার কথা না শুনলে তোমার গলায় আমার দশ আঙুলের অমর ছাপ বসিয়ে দেব।

নিথর পড়ে আছে মরিয়ম। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তার সারা শরীর থেকে কে যেন, যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল সেটুকুও অপহরণ করেছে। ভগবানকে স্মরণ করল মরিয়ম।

সন্ধ্যের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে পৃথিবী। অরণ্যে জীবজন্তুর ডাক উঠছে। ভয়াল নির্জনতা লোহার মত শক্ত আর জমাট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

দূরে অশ্বখুরধ্বনির শব্দ না?

কান খাড়া করল মরিয়ম। হে ভগবান!

রণতুল্লার কথায় আবার শব্দটা মিলিয়ে গেল। রণতুল্লা বলছে, বল। এখনো সময় আছে। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না আমি জানি। কিন্তু তোমাকে তো তেমন মনে হয় না। তুমি নিশ্চয় সম্মান হারাতে চাও না। এখনো তোমার সম্মান বাঁচাবার সময় আছে। কেবল তুমি বল আমার বেগম হবে। তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি। কথা দিলে পরে তুমি কথা পালটাবে না জানি। অবশ্য এখন বাঁচবার জন্য পরে যদি প্রতিশ্রুতি ভাঙ তাহলে হয়তো তখন আমি কিছু করতে পারব না। হয় তো পারব। কিন্তু সে সব পরের কথা। ভবিষ্যতের ব্যাপার কী করে নিজের কব্জাতে আনতে হয় আমার সে রাস্তা জানা আছে। নিজের ওপর আমি ভরসা রাখি।

সে জন্যেই তোমার কথার ওপর আমি বিশ্বাস করব। নইলে এখন তোমাকে বেইজ্জত···

এবার দূরাগত অশ্বখুরধ্বনি অনেক নিকটে। ওরা দুজনেই পরিষ্কার শুনতে পেল।

রণদুল্লার মুখে ভাবান্তর ঘটল পলকে।

কে আসছে ?

তার আমি কী জানি ? মরিয়মের ক্ষীণ কণ্ঠ।

আবছা আলোয় বেশি দূরের লোককে এখন চেনা মুশকিল।

যাক গে যেই আসুক রণদুল্লা কাউকেই ডরায় না। বল, আমার কথার জবাব দাও।

তুমি যা ইচ্ছে করতে পার। মিথ্যে আশা তোমায় আমি দিতে পারব না।

রণদুল্লা খাঁর হিংস্রতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। ওকে বাধা দিল মরিয়ম তার সর্ব শক্তি নিয়োগ করে। আবার শুরু হল ধস্তাধস্তি।

ওরা দু'জনেই অশ্বখুরধ্বনি বিশেষ শুনতে পেল না। যদিও বা সামান্য কানে গেল, তবু সে দিকে কেউই মনোযোগ দিতে পারল না।

রণদুল্লা ভাবল, তার অনুচরদের কেউ হতে পারে।

মরিয়ম ভাবল, এ সময়ে বিদেশী ছাড়া আর কে আসবে এদিকে।

দুজনের ভাবনা ভুল প্রমাণিত হল পর মুহূর্তে। দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

মরিয়মের বুকে আবার যখন হাঁটু গেড়ে বসেছে রণদুল্লা সেই সময় মুখ তুলে তাকিয়ে যাকে দেখল তাকে না দেখে যমকে দেখলেও খুশী হত সে। অট্টহাসি হাসত।

কিন্তু অশ্বারোহীকে দেখে এক লাফে রণদুল্লা উঠে দাঁড়াল। কুর্নিশ করল।

মরিয়ম অসাড় পড়ে থাকল। উঠতে পারত। কিন্তু ওঠবার তার ইচ্ছে করছে না। জীবনের প্রতি তার ভীষণ বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে।

আদিল শা একলাফে ঘোড়া থেকে নেমে মরিয়মের নাকের কাছে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস অনুভব করল।

মরিয়ম!

জাঁহাপনা!

উঠতে পারবে?

মরিয়মকে আলিঙ্গন করে তুলে দিল আদিল শা।

আদিল শার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রণদুল্লার চোখ যেন আগুন হয়ে যাচ্ছে। একা এসেছে সুলতান? একা সুলতানকে শেষ করা রণদুল্লার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টের নয়। আচমকা আক্রমণ না করলেও চলে। সম্মুখ যুদ্ধে বীরের মত আহ্বান করলেও চলে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাঁচটি অশ্বারোহীকে দেখতে পাওয়া গেল কিছু দূরে। সুলতানের দেহরক্ষীবৃন্দ ওরা।

রণদুল্লার চোখ থেকে আগুন ধীরে ধীরে সরে গিয়ে বরফ দেখা গেল। একটা ব্যর্থতার জ্বালা হজম করতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার। দেহের শিরায় উপশিরায় স্নায়ুতে চেতনায় নিজের প্রতি ধিক্কার ছড়িয়ে পড়ছে। তার গোপন ও হিংস্র স্বপ্নটা আর একবার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সুলতান মরিয়মকে বাঁ হাতে জড়িয়ে বজ্র গম্ভীর গলায় বলল, খাঁ সাহেব!

জাঁহাপনা।—জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটি ভিজোতে ভিজোতে বলল রণদুল্লা।

এত দিনে বুঝলাম কেন শত্রুপক্ষের সামনে আমার সৈন্যরা দাঁড়াতে পারছে না, কেন বারে বারে পশ্চাদপসরণ করছে আমার বীরবাহিনী।

মাথা উঁচু করে রণদুল্লা বলল, যা বুঝেছেন তা ঠিক নয় সুলতান।

ঠিক নয়? বিশালগড় থেকে মাত্র দুই ক্রোশ দূরে আমার সৈন্যেরা যখন মরণপণ যুদ্ধ করছে, তখন—ঠিক সেই মুহূর্তে আমারই সেনাপতি আমার বাঈজীর বোরখা তছনছ করছে। এটা কি বেঠিক?

মরিয়মের ঠোঁটের ফাঁকে প্রতিহিংসার হাসি ফুটল।

জাঁহাপনা! আমি আপনার হারেমের বাঈজীর বোরখা তছনছ করতে আসি নি। এসেছি এই মোহিনী বাঈজীর জীবন তছনছ করতে। এই রূপসী বিজাপুরের কী সর্বনাশ করছে আপনি জানেন না।

বিস্ফারিত চোখে আদিল শা প্রতি-প্রশ্ন করতে পারল না সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক ঢোঁক গিলে বলল, কী বলছেন খাঁ সাহেব! অযথা অন্যের প্রতি দোষারোপের দণ্ড নিশ্চয় আপনার জানা আছে?

আছে হুজুর। যথেষ্ট প্রমাণ আমার হাতে না থাকলে আমি বুক ঠুকে বলতে পারতাম না। গুলবর্গা দুর্গ হাত ছাড়া হওয়ার পিছনে·· এর বিশ্বাসঘাতকতা অন্যতম প্রধান দায়ী। কোথায় কোন সৈন্যবাহিনী অবস্থান করত গুলবর্গা দুর্গে, কোথায় কোথায় ছিল অস্ত্রভাণ্ডার, কোন পথে কোথায় যাওয়া যায়···এই সব খবর পাচার করেছে ওই আপনার প্রিয়তমা বাঈজী।

আদিল শা তবু গর্জন করে উঠল, প্রমাণ?

ওর গর্জনের ধ্বনি সন্ধ্যার অন্ধকারে অরণ্যের কোষে কোষে প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড় থেকে ফিরে এসে এসে।

আদিল শা হাততালি দিল।

প্রধান দেহরক্ষী ঘোড়া ছুটিয়ে কাছে এল।

মশাল।—বলল আদিল শা।

দু দিকে দুটি মশাল মাটিতে পুঁতে জ্বেলে দিল মশালচি। আবার তারা সরে গেল কিয়দ্দূরে।

প্রমাণ? টেনে টেনে বলল আদিল শা।

মশালের আলো কাঁপছে নির্জনতম পাহাড়ী প্রান্তরে। চতুর্দিকে জন্তুর অস্তিত্বের ভয়। কারুর কারুর অলৌকিক অস্তিত্বের ভয়টাও নেহাৎ কম নয়।

মুনীর উদ্দিনকে ডাকুন জাঁহাপনা। যে সওয়ানি নিগার গুলবর্গার আশেপাশে কর্মরত ছিল তার মুখ থেকেই শুনুন।

মরিয়ম তো কোনোদিন গুলবর্গায় যায় নি।

হ্যাঁ যায় নি। কিন্তু আপনি যখন মত্ত থাকতেন তখন কৌশলে জেনে নিয়ে থাকবে। আর সব কৌশল কায়দা নক্সা সমেত উর্দুতে লিখে পাচার করেছে আমাদের শত্রুপক্ষের হাতে।

মত্ত অবস্থায় কোনো মানুষ একেবারে জ্ঞান হারায় না খাঁ সাহেব।

ঠিক জাঁহাপনা। আপনার মদের সঙ্গে কোকেন জাতীয় কিছু মেশানো হয় যাতে আপনার জ্ঞান একেবারে লোপ পেতে পারে।

আদিল শার মনে হল এ মিথ্যে নয়। জলসাঘরে রাত কাটিয়ে যে দিন ফিরে যায় তার পর দিন সকালে রোজ গা হাত পা কেমন অসাড় অসাড় ঠেকে। তখন মনে করত জলসাঘরে প্রচুর মদ্য পানের ফল এবং প্রচণ্ড উত্তেজিত পরিবেশে থাকার পরিণাম।

আদিল শা মরিয়মকে বাঁ হাত থেকে মুক্ত করল।

বলল, কাল সকালে দরবারে হাজির থাকবে বাঈজী। আপনিও খাঁ সাহেব।

আদিল শা আবার হাততালি দিয়ে ডাকল দেহরক্ষীপ্রধানকে। আদেশ দিল সুলতান, চারজন রক্ষী বাঈজীমঞ্জিলে পাহারা দেবে। এবং কাল সকালে মরিয়মকে দরবার কক্ষে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে।

অর্থাৎ মরিয়ম আদিল শার নজরবন্দিনী।

আর মুহূর্ত এখানে থাকতে পারছে না আদিল শা। তার পায়ের তলা থেকে বাস্তবতা যেন সরে গেছে। তার সামনে কারা যেন নির্মম হস্তে ভেঙে চূরে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে আজীবনের স্বপ্ন। এর চেয়ে গোটা পৃথিবী এক নিমেষে ছাই ছাই হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে মিলিয়ে গেলে ভালো হত।

বহুবার যাকে অবিশ্বাস করেও বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, বহুবার যাকে জীবন থেকে মুছে ফেলতে গিয়েও ফেলতে পারে নি—তার

সান্নিধ্যে আর এক পলকও যেন থাকতে পারছে না আদিল শা। জীবনের সব চেয়ে প্রিয় বস্তু যদি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে যায় তার অনুভব সেই জানে যে ভুক্তভোগী।

আদিল শা মরিয়মের দিকে ফিরেও তাকাল না। ছুটে গিয়ে চাপল তার ঘোড়ার পিঠে। অদৃশ্য হয়ে গেল দিগন্ত প্রসারিত অন্ধকারের বুকে, সামান্য নক্ষত্রর মতও জ্বলল না তার অস্তিত্ব।

মরিয়ম দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে ফিরে চলল ধীরে ধীরে।

রণতুল্লা আগেই আদিল শাকে অনুসরণ করেছে।

দরবার কক্ষ আজ পূর্ণ।

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে মরিয়ম বাঈএর বিচারের কথা। বহু কৌতূহলী সৈন্য সামন্ত বাঁদী বাঈজীর যাতায়াত বেড়ে গেছে দরবার কক্ষের পাশ দিয়ে। সবাই একে-তাকে প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছে বিচারের শুনানী।

আদিল শা আজ একেবারে স্থির।

গতকাল সারা রাত্রি জেগে কেটেছে তার। পায়চারী করেছে পালঙ্কের চার পাশে। আর পাত্রর পর পাত্র মদ গিলেছে। সুবিচার তাকে করতেই হবে। নিজের ও রাজ্যের দিকে তাকিয়ে, নিজের ও রাজ্যের নিরাপত্তার চিন্তা করে সুবিচার করবে আদিল শা।

এও কি হতে পারে না মরিয়মের দেহ-লাভে ব্যর্থ হয়ে রণতুল্লা এই সব মিথ্যে অভিযোগ খাড়া করেছে? হতে পারে। হতে না-ও পারে। কার জবানবন্দী সত্য, কার মিথ্যে এ বোঝার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে সুলতানের।

রণতুল্লা বারবার দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে। আর একটা একটা দাড়ি টানছে তার।

আমীর ওমরাহ জায়গীরদার সেনাপতি ইত্যাদি গণ্য-মান্য

ব্যক্তিদের পোষাকের বাহারে দরবার আজ জমজমাট। আতরের গন্ধে বাতাস পালাচ্ছে। বাঁদী বাঈজীদের আনাগোনায় কক্ষ মদির।

আদিল শা হাঁকল, মুনির উদ্দিন হাজির?

রণতুল্লা একজন সওয়ানি নিগারকে ধরে এনে সুলতানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

সিংহাসন থেকে শাণিত তরবারির খোঁচার মত দৃষ্টি বিদ্ধ করে আদিল শা দেখল লোকটাকে।

মরিয়ম?

হাজির জাঁহাপনা।

দরবার কক্ষে ঢুকতে ঢুকতে দূর থেকেই বলল মরিয়ম। গতকালের চিন্তার ভাবনার ছাপ তার রূপের ওপর স্পষ্ট। মরিয়মের শরীর মৃদু মৃদু কাঁপছে। পদক্ষেপ চঞ্চল। ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। বিধ্বস্ত বসরাই গোলাপ যেন দরবার কক্ষে হাজির হয়েছে।

অতি সন্তর্পণে নিজের আসনটিতে গিয়ে বসল মরিয়ম।

মুনির উদ্দিন—আদিল বলল বিচারকের গাম্ভীর্যে।

জাঁহাপনা।

মরিয়মবাঈকে তুমি চেন?

হ্যাঁ হুজুর।

কোথায় দেখেছ?

অনেক জায়গায় দেখেছি।

কোথায় কোথায়?

বাগিচায় দেখেছি, নাচঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখেছি। আরও....মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলতে গিয়ে মুনির থামল হঠাৎ।

আর কোথায়?

প্রধান ফটকের কাছে।

কী করছিল মরিয়মবাঈ? তুমিই বা কী করছিলে?

সোরগোল শুনে আমি রুটি পাকানো ছেড়ে দিয়ে ছুটে

গিয়েছিলাম। দেখি মরিয়মবাঈ শান্তারাওএর জন্য ধমকাচ্ছে মহম্মদকে।

তুমি জানিয়েছ খাঁ সাহেবকে যে মরিয়মবাঈ গুলবর্গা দুর্গের নক্সা ও যুদ্ধ কৌশল উর্দুতে লিখে পাচার করেছে শিবাজীর হাতে। এর প্রমাণ?

প্রমাণ? ঢোঁক গিলল মুনির উদ্দিন।

জাঁহাপনা, এ মিথ্যে অভিযোগ। আমি আল্লার নামে শপথ করে বলতে পারি এ মিথ্যে। দাঁড়িয়ে উঠে মরিয়ম চীৎকার করে বলল।

তোমাকে প্রশ্ন করলে তখন জবাব দেবে। তুমি বস।—আদিল শা হাঁকল।

মরিয়ম দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়ল।

জাঁহাপনা—এর কী প্রমাণ দেব। ওর লেখা কাগজপত্র তো আর আমার কাছে নেই। ও সব তো এখন শিবাজীর কাছে। গুলবর্গা দুর্গের গুপ্তচরদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে আদিল শার হারেমের বাঈজী শিবাজীকে সব খবর দিচ্ছে।

তুমি যেতে পার মুনির উদ্দিন।

মুনির উদ্দিন ভীরু শেয়ালের মত দরবারের পেছনে গিয়ে বসল।

রণদুল্লা খাঁ সাহেব!

জাঁহাপনা!

আর কিছু আপনার বলার আছে?

আছে হুজুর।

রণদুল্লা দাড়ির গোড়া থেকে অগ্রভাগ পর্যন্ত মুঠো ধরে টানছে বারবার। সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বলল, আফজল খাঁ হত্যার আগে যখন কৃষ্ণাজী আফজলের দূত হয়ে শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল তখন মরিয়মবাঈ কৃষ্ণাজীর কাছে কেন গিয়েছিল ওকে একবার জিজ্ঞেস করুন হুজুর।

তুমিই বল।

আফজল খাঁর হত্যার কৌশল যাতে কৃষ্ণাজী শিবাজীর নিকটে প্রকাশ করে দেয় তার জন্য অনুরোধ করতে গিয়েছিল মরিয়ম।

প্রমাণ?

কৃষ্ণাজীকে ডাকুন।

কৃষ্ণাজী গেছে আওরঙ্গজেবের দরবারে আমার খবর বহন করে। ফিরে এলেই জানতে পারবেন জাঁহাপনা।

তাহলে কৃষ্ণাজীও অপরাধী?

হ্যাঁ সুলতান।

তুমি এতকাল এ খবর আমায় দাও নি কেন?

তার এক গোপন কারণ আছে জাঁহাপনা।

কী সেই গোপন কারণ! কৃষ্ণাজীকে দিয়ে গোপন খবরাখবর বহন বন্ধ করতে, আমার কাছে কেন আবেদন জানাও নি? মরিয়মের মুখের দিকে চোখ ছিল বলে?

না সুলতান। দরবার কক্ষে এমন অভিযোগ এনে আমায় অপমান করবেন না।

আপনাকে অপমান করছি না খাঁ সাহেব। সাবধান করে দিচ্ছি। আপনার ওপর বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছি আমি। সাবধান করে দেবার অধিকার আছে সুলতানের। আচ্ছা....কৃষ্ণাজী আগ্রা থেকে ফিরুক, তারপর মরিয়মের বিচারের রায় ঘোষণা করব।

জাঁহাপনা, বিচারের পালা আর মুলতবী রাখবেন না। শিবাজীর সৈন্যবাহিনী যে গতিতে এগোচ্ছে, যে ভাবে আস্তে আস্তে শিবাজীর সৈন্য আমাদেরকে ঘেরাও করছে চতুর্দিক থেকে, তাতে আমার মনে হয় বিচারের দরবারে আপনি অনতিবিলম্বে বসতে পারবেন না। আজকেই শেষ করুন জাঁহাপনা। আপনার সেনাপতির কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না? বিশ্বাস করছেন ওই বিশ্বাস-ঘাতিনীকে?

মরিয়ম।—ডাকল সুলতান।

মরিয়ম উঠে দাঁড়াল।

তোমার কী বলবার আছে?

মরিয়ম চুপ। তার মনের মধ্যে শত শত যুদ্ধক্ষেত্র। শত শত যুদ্ধ চলছে। কী বলবে সে।

তোমার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পার।—আদিল শা বলল আবার নীরস কণ্ঠে।

আমার কিছু বলবার নেই জাঁহাপনা।—বিড় বিড় করে বলল মরিয়ম। বসে পড়ল।

আদিল শা তখন ধীর গম্ভীর গলায় দরবার কক্ষে গমগম ধ্বনি তুলে বলল, মরিয়মবাঈ যে অপরাধ করেছে তার শাস্তি সবচেয়ে নির্মম হওয়া উচিত। মানুষের জীবনে সবচেয়ে জঘন্য কাজ বিশ্বাস-ঘাতকতা। এই সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠেছে বিশ্বাসের উপর। বিশ্বাস হারালে আর কিছু থাকে না সভ্যতার। বিশ্বাসহীনতার সন্দেহ মানুষকে প্রতি মুহূর্তে বিষের মত যন্ত্রণা দেয়···সেই যন্ত্রণা মরিয়ম দিয়েছে আমাকে এবং বিজাপুরকে। তরবারীর আঘাতে মস্তক ছেদন করলে শাস্তি পর্যাপ্ত হবে না। আগুনে পুড়িয়ে মারলেও অনেক আরামে মরবে। ওকে পুঁতে কুকুরকে দিয়ে খাওয়ালেও বিশেষ কষ্ট হবে বলে মনে হয় না। অচিন্ত্যনীয় অকল্পনীয় কৌশল আমি ভেবেছি। ও যে প্রাসাদে স্বপ্নের সম্ভার গড়ে তুলেছে, যে বাসস্থানে ও নিজেকে সবচেয়ে সুখী ভাবে, সেই বাঈজীমঞ্জিলের শয়নকক্ষে ওকে বন্ধ করে দিতে হবে। আর কপাট ও গবাক্ষগুলি রুদ্ধ করে দিতে হবে এমন ভাবে যাতে সামান্য মাত্র বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। বাতাসের অভাবে, খাদ্যের অভাবে, আলোর অভাবে, জীবনের সাহচর্যের অভাবে আস্তে আস্তে তিলে তিলে মৃত্যুকে অনুভব করবে মরিয়ম....হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ আদিল শা উন্মত্তের মত হাসতে লাগল। বলল আবার, আর কিছুকাল বাদে যে বাঈজীর শরীরের জন্য মানুষ পাগল হয়ে গিয়েছিল, সেই শরীর কঙ্কালের রূপ নিয়ে রূপসীকে

ব্যঙ্গ করবে। কিম্বা কঙ্কালটাও কিছুকাল বাদে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে।

নিঝুম হয়ে শুনল মরিয়ম।

বিচারের শেষে তাকে বেষ্টন করে নিয়ে গেল আট দশ জন সিপাহী।

দরবারে চলল রাষ্ট্রশাসনের পরামর্শ।

মরিয়মের শাস্তিতে দরবারের কেউ কেউ সমবেদনা প্রকাশ করল। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই খুশী হল।

আদিল শা আশা করেছিল বিশালগড় শত্রুর দখলে যাবে না। রণদুল্লাও সে ভরসা দিয়ে গেছে। অন্যান্য সেনানীরাও বজ্র কঠোর সংকল্পে বলীয়ান হয়ে লড়াই করবে। বিজাপুরের শৌর্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। শিবাজী উপলব্ধি করবে আদিল শাহের বিক্রম।

কিন্তু আদিল শাহের সব আশা, সব আকাঙ্ক্ষা দিবাস্বপ্নে পর্য-বসিত হয়ে গেছে। এইমাত্র ফৌজদার খবর নিয়ে এসেছে। বিশাল গড় দুর্গ অবরুদ্ধ হয়ে আছে শিবাজীর সৈন্য সামন্তদের দ্বারা। মুহূর্মুহু কামান গর্জন করছে, গোলাবারুদ ক্ষয় হচ্ছে জলের স্রোতের মত। কিন্তু কতক্ষণ লড়াই করবে সাতহাজার সৈনিক। কতক্ষণ চালাবে প্রতিরোধ? যুদ্ধ-সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে গেলে কোথা থেকে সংগ্রহ করবে কামানের গোলা, কোথা থেকে পাবে রসদ? অবরুদ্ধ ঐ সাত হাজারের বাহিনীকে উদ্ধার করতে হলে আর একটি নতুন বাহিনীকে আজই চালনা করতে হবে বিশাল গড়ের পথে।

কিন্তু সে বাহিনী কোথায়? এ দিকে মীনাক্ষীপুরের পাহাড়ের সানুদেশেও চলছে তুমুল লড়াই। বিকেল বেলা পর্যন্ত যা খবর তাতে কামান বন্দুক ছেড়ে হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়েছে। সেখানেও

বিজাপুর-বাহিনী পর্যুদস্ত। পাঁচ হাজার সৈন্যের রক্তে লাল হয়ে গেছে চড়াই উৎরাই। যারা জীবিত আছে তারা সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। পিছন থেকে একটি বড় বাহিনী যদি প্রতি-আক্রমণ করতে পারে শত্রু সৈন্যদের, তাহলে হয়তো রক্ষা পাবে মীনাক্ষীপুর। নতুবা সসৈন্য মীনাক্ষীপুর শিবাজীর করায়ত্ত হবে।

একান্তই দুর্দিন বিজাপুরের। বুঝি বা পরাজিত হল আদিল শাহ। বিশালগড় থেকে রণদুল্লা ফিরতে পারবে কি না অনিশ্চিত।

কি করা যায় এ মুহূর্তে? নিজে গিয়ে দাঁড়াবে বিজাপুর সৈন্যদের পুরোভাগে? কিন্তু কখন? এখন কি আর সময় আছে সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করার? কী করে প্রবেশ করবে অবরুদ্ধ দুর্গে?

কী করা যায় এখন? হারেমের মেয়ে শিশুদের সরিয়ে দেওয়ার বোধ হয় এই সময়। হীরে জহরৎ মণিমুক্তো ইত্যাদি মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করাও দরকার।

জীবনের সব জিনিস পালানোর সময়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। নিয়ে যাওয়া যায় কেবল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস—বিশেষ যে-গুলি অমূল্য, আর নিয়ে যাওয়া যায় প্রিয় আত্মীয় পরিজন।

এ সব তো নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কিছু বা কেউ বাদ পড়ে যাবে না তো?

কে?

মরিয়ম?

আদিল শার মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে তো শয়ন কক্ষে নিমজ্জিত হতে চলেছে। আগামী কালের ভিতর দরজা জানালাগুলি অবরোধ করা শেষ হয়ে যাবে।

এক সিপাহী মরিয়মবাঈএর খত দিয়ে গেল।

লেখা: জাঁহাপনার সঙ্গে শেষ দেখা করতে চায়!—মরিয়ম।

অস্থির হয়ে উঠল আদিল শা।

অপরাধিনীর সঙ্গে দেখা করবে কিনা ভাবল বহুক্ষণ। শেষে যাওয়াই ঠিক করল।

পূর্ণ চাঁদ আকাশে।

এমন বহু চাঁদিনীর রাতে মরিয়মের সান্নিধ্য লাভ করেছে আদিল শা। সে রাত্রিগুলির স্মৃতি আজ তাকে বারবার পীড়া দিল।

পাহাড়ী উপত্যকার প্রায় চারদিকে গভীর জঙ্গলের গায়ে চাঁদের আলো পড়ে ভয়ঙ্কর রহস্যময়তা সৃষ্টি করেছে। কোনো রকমে পথ চিনে চলতে পারা যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে। প্রান্তরে পথ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না।

তেজীয়ান ঘোড়ার পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে জঙ্গলে পাহাড়ে। ধূসরতা ও শ্যামলতার সঙ্গে জ্যোৎস্নার শ্বেতবর্ণ মিলে অদ্ভুত এক মিশ্র-রঙের সৃষ্টি করেছে প্রকৃতি। অলৌকিক যাত্রীর মত আদিল শা চলেছে ধীর গতিতে।

কেন চলেছে ?

আজও মরিয়মের জন্য দুর্বলতা পোষণ করে তার বিচারক মন ? দুর্বলতা পোষণ করা মোটেই উচিত নয়। বিচারকের চেতনা হবে নিরপেক্ষ নির্মম।

প্রেমলিপ্সু আদিল শা আর বিচারক আদিল শা যে একই ব্যক্তি। দুটি পৃথক খণ্ডে তাদের সত্তা কি ভাগ করা যায় ? যায় না।

যতই বিপদ ঘিরে আসছে বিজাপুর রাজ্যে, ততই আদিল শার মন উদ্বেগে ক্ষতবিক্ষত। ততই বিরাট দুর্ভেদ্য দুর্গগুলিকে অবিশ্বাস করছে। মনে হচ্ছে নিরাপত্তা বলে কিছু নেই রাজাবাদশাদের জীবনে।

গৃহকোণ এর চেয়ে অনেক বেশি কাম্য এবং নিরাপদ মনে হচ্ছে। সাধারণ এক কুটিরে যে পরিমাণ নিরাপত্তা রাজাবাদশার প্রাসাদে তার শতাংশও নেই মনে হচ্ছে।

মরিয়ম মোমবাতির আলোয় কাপড়ের কোণ পোড়াচ্ছিল, সুতো টেনে নিয়ে। সুতোগুলো পুড়ে অনেক ছাই জমে গেছে মেঝের কার্পেটে।

তাড়াতাড়ি উঠে এসে সুলতানের দুটি হাত ধরতে গেল। কয়েক পা পেছিয়ে গেল আদিল শা।

বলল, কেন ডেকেছ।

আদিল শার গলায় শ্লেষ্মা জড়িয়ে গেল। কেশে গলা সাফ করে নিল। কাশিতে মাথার তাজ সরে গিয়েছিল। তাজটাকে যথাস্থানে টিপে বসিয়ে দিল।

ভেতরেও আসবেন না জাঁহাপনা? আমার আনন্দময় জীবন উপভোগ করেছেন, আমার মৃত্যু ভোগ করতে বলছি না, আমার মৃত্যুটাকে অন্তত দেখে যান।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল আদিল শা, দেখার কিছু নেই। এই মৃত্যু একরকম মনশ্চক্ষে দেখা। নইলে এর ভীষণতা স্মরণ করে দণ্ড দিতে পারতাম?

হাওয়া প্রায় রুদ্ধ। বাইরের পৃথিবীতে পূর্ণ চাঁদ নিয়ে যে মাতামাতি চলেছে তার কণামাত্র এই কক্ষে এসে পৌঁছতে পারছে না। এই ঘরে ঢুকলে পৃথিবীর বিপুল বৈচিত্র্যের বিস্মৃতি এসে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে।

মরিয়ম আদিল শার কাছে গিয়ে বলল, প্রায় বিনা অপরাধের শাস্তি আমি নিতে চলেছি জাঁহাপনা।

প্রায় বিনা অপরাধ মানে? অপরাধ তাহলে তুমি করেছ?

বাঈজীমঞ্জিলেরই এক বান্দা এসে কুর্ণিশ করল হঠাৎ। জাঁহাপনা!

এগিয়ে গেল আদিল দরজার কাছে।

কী সংবাদ।

সওয়ানি নিগার।

নিয়ে এস।

কয়েক পলক বাদেই বান্দা এক গুপ্তচরকে সঙ্গে নিয়ে এল।

কী খবর? অদিল শা প্রশ্ন করল।

সওয়ানি নিগার জানাল বিশালগড় দুর্গে বিজাপুরবাহিনী ছত্রভঙ্গ। সাত হাজার সৈন্যের মধ্যে কত জন যে প্রাণ দিয়েছে তা নিরূপণ করা সাধ্যাতীত। বিশালগড়ের পতন সমাসন্ন।

বিশালগড়ের পতন বিজাপুরের পতনের সূচনা। অব্যর্থ সূচনা। আদিল পাগলের মত পায়চারি করতে লাগল। প্রায়-অবরুদ্ধ শয়ন কক্ষের অসহ্য গরম এখন অনুভব করছে না আদিল শা।

মরিয়ম সুলতানের হাত ধরে বলল, জাঁহাপনা, বাঁদী বাঈজীর পেছনে শক্তিক্ষয় করে কী যুদ্ধ করবে রণতুল্লা?

নিরুত্তর আদিল শা।

যে লোক মিথ্যার আশ্রয়ে নিরপরাধকে অপরাধী প্রমাণ করে তাকে নিশ্চয় শাস্তি দেবেন আল্লা। বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, আমি এমন অপরাধ করি নি যাতে আপনার ক্ষতি হতে পারে, বা আপনার রাজ্যের ক্ষতি হতে পারে?

আদিল নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, কী করেছ তুমি? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কিছু গোপনীয় কার্যকলাপ তোমার আছে বা ছিল?

ছিল জাঁহাপনা। আজ আপনার কাছে সব খুলে বলব বলেই আপনাকে ডেকেছি। হয়তো আপনি অবিশ্বাস করবেন। বিশ্বাস করুন আর অবিশ্বাস করুন, মৃত্যুর আগে আপনাকে আমার সব জানিয়ে যাওয়া দরকার।

মোমবাতি নিভে আসছিল, অন্য একটা নতুন বড় মোমবাতি জ্বালল মরিয়ম।

গলায় যথাসাধ্য স্নেহ ঢেলে মরিয়ম আবার শুরু করল, জাঁহাপনা আপনাকে আমি ভালোবাসি—

বাজে কথা বোল না মরিয়ম—কর্কশ কণ্ঠে ধমকাল আদিল শাহ। যা বলবার বলে যাও, কোনো মন্তব্য জুড়ো না।

সত্যি বলছি জাঁহাপনা। সেই জন্য আপনার ও বিজাপুরের বিপদ আসতে পারে বুঝে আপনাকে আমি বারবার সাবধান করে দিয়েছি। আপনার মঙ্গলের জন্য শিবাজীর সঙ্গে হাত মেলাতে বলেছি জাঁহাপনা। আমি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি মানুষ হয়েছি। তাদের আনন্দ তাদের দুঃখ আমি চিনি। আপনার রাজত্বে সাধারণ মানুষের দুর্দশা আমি সহ্য করতে পারি নি। শিবাজী সাধারণ মানুষের সুখের জন্য আনন্দের জন্য রাজ্য গঠন করছে জেনে এবং শুনে আমি শিবাজীকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করি। আমি যখন জানতে পারলাম আফজল খাঁ অন্যায় ভাবে শিবাজীকে হত্যা করতে যাচ্ছে আর তার খবর নিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণাজী, আমি তখন সত্যি কৃষ্ণাজীকে অনুরোধ করি হত্যার চক্রান্ত সে যেন শিবাজীর কানে তুলে দেয়। কৃষ্ণাজী প্রথমে কিছুতেই রাজি হতে চায় না। শেষে তাকে অনেক যুক্তি দেখিয়ে রাজী করাই। শিবাজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবশতই শাস্তারাওকে বাঁচাই। বীরাবাঈকে পালাতে সাহায্য করি।....কিন্তু শিবাজীর কাছে গুলবর্গা দুর্গের গোপন মানচিত্র পাচার করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে জাঁহাপনা। আমার দেহলাভে বার বার ব্যর্থ হয়ে আমাকে শাসিয়েছিল রণদুল্লা। এমন কি আপনাকে হত্যা করে আমাকে ভোগ করবে বলেছিল। যখন সে দেখল আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছি না তখন আমাকে হত্যার ভয়ও দেখাল। তাতেও যখন আমায় বাগ মানাতে পারল না তখন মিথ্যে অভিযোগ এনে আপনার প্রিয় বাঈজীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করাল আপনারই মুখ দিয়ে।···জাঁহা-পনা···জীবনকে দেখুন···দুঃখকে দেখুন—মানুষকে দেখুন···দুঃখীকে দেখুন—শুধু এই আমি চেয়েছিলাম। এ নিশ্চয় পাপ নয়, অপরাধ নয়? জাঁহাপনা, চলুন আমরা বিজাপুর ছেড়ে চলে যাই। আজ হোক কাল হোক পরশু হোক—আমি জানি—আপনিও ভালোভাবে জানেন যে বিজাপুরের পতন অবশ্যম্ভাবী। তবে আর কেন? আর এই বিরাট ধ্বংসের মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?

চলুন আমরা দুজনে পালিয়ে যাই। এত বড় দেশ হিন্দুস্থান, কোথাও না কোথাও আমাদের দুজনের ঠাঁই হবেই হবে। সেখানে আপনি আমার একার বাদশা, আর আমি আপনার একার বেগম।

মরিয়ম দু হাঁটুতে ভর করে আদিল শার কোমর জড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

মরিয়ম বলে চলল, জাঁহাপনা আপনি যেন ভাববেন না, মরিয়ম মৃত্যুর ভয়ে আপনাকে এত কথা বলছে। আমি তো মরবই কিন্তু আপনিও যে বাঁচতে···

কয়েকটি দ্রুতগামী অশ্বের খুরধ্বনিতে মরিয়মের সংলাপ চাপা পড়ে গেল। বাঈজীমঞ্জিলের প্রধান তোরণে নামল কয়েকজন বর্মাবৃত সৈন্য। তাদের দ্রুত ধাবমান পায়ের শব্দ। শয়ন কক্ষের বাইরে থামল শব্দগুলি!

জাঁহাপনা....

ছুটে গেল আদিল শা। দেখল বিশাল গড় থেকে এসেছে চারজন সৈন্য। তাদের দেহ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। পোষাক পরিচ্ছদ পর্যুদস্ত।

কী খবর বিশালগড়ের? উৎকণ্ঠায় আদিল শার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

খাঁ সাহেব মারা গেছেন জাঁহাপনা! বিশাল গড় দখল করেছে শান্তারাওবাহিনী!

আদিল শা ধুলোতেই বসে পড়ল। মরিয়মের দিকে একবার তাকাল, চোখে হতাশ ক্রোধের আভাস। শান্তারাওকে যদি না ছেড়ে দিত তাহলে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্য কথা লেখা হত। আবার ভাবল আদিল শা, শান্তারাও ছাড়াও তো আরও অনেক যোদ্ধা আছে শিবাজীর। হয়ত শান্তারাও গেলেও আজকের ইতিহাসে ইতর বিশেষ পরিবর্তন ঘটত না।

তাকে এক্ষুণি দুর্গ প্রাসাদে যেতে হবে। এখনি আর মুহূর্ত দেরী নয়। শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।

ধুলো ঝেড়ে আদিল শা উঠল দৃপ্ত ভঙ্গিতে।

বলল, ও হয় না মরিয়ম। দরবারে যে বিচার আমি করেছি তার অদলবদল অসম্ভব। আর বিজাপুর ছেড়ে আমি শেয়ালের মত পালাতে পারব না। আমরা হলাম যোদ্ধার জাত। যুদ্ধেই আমাদের জীবন, যুদ্ধেই আমাদের মৃত্যু। ছুটন্ত অশ্বের পিঠেই আমাদের শয়ন কক্ষ, আমাদের দরবার। তোমাকে নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে আমি বাস করতে পারব না।—একটু চুপ থেকে আদিল শা হাঁকল, বান্দা—

ছুটে এল তিনজন বান্দা।

কেওয়ারি বন্দ কর দো।

আদিল শা তাড়াতাড়ি বাইরে এল। তিনজন বান্দা বিশাল লৌহকপাট প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ করে দিল।

বন্ধ দরজায় মুহুর্মূহু আঘাত হেনে মরিয়ম চীৎকার করল, জাঁহাপনা···আদিল ··আমার প্রিয় আদিল···

চোখ মুছতে মুছতে ছুটল আদিল শা, যতক্ষণ শোনা গেল মরিয়মের আর্তনাদ। তারপর যখন আর্তনাদ আর শোনা গেল না তখন মন্থর গতিতে হেঁটে অপেক্ষারত ঘোড়ার পিঠে চাপল লাফ দিয়ে।

ঘোড়া ছুটল।

আদিল শা ভাবছে বিজাপুরের বিপদ কী ভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়। পাহাড়ে জঙ্গলে প্রান্তরে চাঁদিনীর অজস্র পরীদল নৃত্য করছে মনে হল তার ঝাপসা চোখে। যতই চোখ মুছছে আদিল, ঝাপসা দৃষ্টি তবু পরিষ্কার হচ্ছে না।

বাঈজী মঞ্জিলের শয়ন কক্ষ পরদিন সকালে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ভিতরে মরিয়মবাঈ কী করেছে—কেঁদেছে না

হসেছে, অস্থিরতায় পাগল হয়ে গেছে, না একেবারে চুপচাপ ছিল, সে সব খবর বহির্জগত জানতে পারে নি। অথবা কতদিন ধরে আলোহীন বাতাসহীন খাদ্যহীন বাঈজীর জীবন তিলতিল যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, তাও কেউ বলতে পারে না।

বাঈজীমঞ্জিল পরিত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিল বান্দারা। ভয়ে। প্রেতাত্মার ভয়ে। প্রেতাত্মা বোধহয় আর কাউকে না পেয়ে বাঈজী মঞ্জিলেরই গলা জড়িয়ে ধরেছিল এবং একটু একটু করে ধুলো হয়ে গিয়েছিল বাঈজীমঞ্জিল।